প্রতিবেদন

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৬

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

প্রতিবেদন

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৬

স্থানঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

ও

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা

তারিখঃ ২৪-২৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি.

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

প্রকাশক
জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার জেনারেল

সম্পাদনা
জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন
রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ

জনাব এস, এম, এরশাদুল আলম
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (সার্বিক), হাইকোর্ট বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতা
বেগম হোসনে আরা আকতার
স্পেশাল অফিসার, হাইকোর্ট বিভাগ

জনাব মোঃ সাব্বির ফয়েজ
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার), হাইকোর্ট বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সার্বিক ও আদি অধিক্ষেত্র), হাইকোর্ট বিভাগ

জনাব মোঃ আজিজুল হক
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার), হাইকোর্ট বিভাগ

জনাব মো'তাছিম বিল্যাহ
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার), হাইকোর্ট বিভাগ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন সমন্বয়
জনাব মোঃ শামীম সুফী
গবেষণা ও তথ্য কর্মকর্তা, আপীল বিভাগ

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৮১৯২৬-৩৪৮১
ফোন : ০২-৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩
ই-মেইল : tithyprinting@hotmail.com

প্রতিবেদকবৃন্দ

জনাব এ, ই, এম, ইসমাইল হোসেন	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা
জনাব মুহাঃ হাসানুজ্জামান	বিচারক (যুগ্ম জেলা জজ), ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা
জনাব শাহরিয়ার আরাফাত	সিনিয়র সহকারী সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
জনাব নিত্যানন্দ সরকার	যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা
জনাব মোঃ সিকান্দার জুলকার নাইন	সংযুক্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম জেলা জজ), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
জনাব মোঃ মাসুদ পারভেজ	যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা
জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোছাইন	সংযুক্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম জেলা জজ), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
জনাব মোঃ কায়সারুল ইসলাম	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা
জনাব সাব্বির মাহমুদ চৌধুরী	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ), ঢাকা
জনাব আল আসাদ মোঃ মাহমুদুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট, ঢাকা
জনাব সৈয়দ তফাজ্জল হাসান হিরু	সিনিয়র সহকারী জজ, ঢাকা
জনাব মোহাম্মদ বদিউজ্জামান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
জনাব হাসান মোঃ আরিফুর রহমান	গবেষণা কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী জজ) আইন কমিশন, ঢাকা
জনাব মোঃ মাহবুব সোবহানী	স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিএমএম কোর্ট, ঢাকা
জনাব মো: ফাহিম ফয়সাল	সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী জজ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা
জনাব শামীম আহমেদ	সিনিয়র সহকারী জজ, ঢাকা
জনাব মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা
জনাব মোঃ মাজহারুল হক	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা
জনাব এ.কে.এম রকিবুল হাসান	সহকারী জজ, সিলেট
জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকা

মুখবন্ধ

ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও লাখো শহীদের প্রাণোৎসর্গের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার মাধ্যমে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

একটি দেশের গণতান্ত্রিক সফলতা বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে বিচার বিভাগের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি বিচার বিভাগের অর্থবহ স্বাধীনতাই হতে পারে নাগরিক স্বাধীনতার সর্বোত্তম নিশ্চয়তা। তাই নাগরিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগের মূল চালিকাশক্তি বিচারকগণকেই সর্বতোভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সারাদেশে অধস্তন আদালতের বিচার কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতিগণ এবং দেশের অধস্তন আদালতের সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে ২০১৫ সালে প্রথম বারের মতো 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালেও 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬' অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিচার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে দেশের বিচারপ্রার্থী জনগণের কাছে বিচারিক সেবা সহজে পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে বক্তারা বিচার বিভাগের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে বিচারকগণের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তার অভাব, অবকাঠামোগত সমস্যা, তথ্য-প্রযুক্তির অপ্রতুলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকগণ যে সকল সমস্যা এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। সে লক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রথম বারের মতো 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬' এর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেদন প্রকাশে সহযোগিতার জন্য 'প্রতিবেদন প্রকাশনা কমিটি'র সদস্যবৃন্দসহ সুপ্রীম কোর্ট প্রশাসনে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি আশা করি এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই উদ্যোগী হবেন এবং এর মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি আরও সহজলভ্য হবে।

(সৈয়দ আমিনুল ইসলাম)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ

গত ২৪-২৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২য় জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম দিনে বিচার বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের সামগ্রিক আলোচনা এবং দ্বিতীয় দিনে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁদের সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন। সম্মেলনটি বিচার বিভাগের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী; মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় জনাব শামসুর রহমান শরীফ এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

বক্তারা বিচার বিভাগের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে বিচারকদের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তার অভাব; অবকাঠামোগত সমস্যা; তথ্য-প্রযুক্তির অপ্রতুলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বক্তাগণ বিচার বিভাগে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে জোর প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি অধিবেশনে "বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন" এর শুভ উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতাকে সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে অভিহিত করেন। এরপর তিনি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আইনের শাসন দৃঢ় করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত সমস্যা, মামলাজট, বিচারকের স্বল্পতা ইত্যাদি সমস্যার উপর আলোকপাত করেন। অন্যান্য বক্তাগণের মত প্রধান বিচারপতির বক্তব্যেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রথম দিনের সমাপনী অধিবেশনে দেশের অধস্তন আদালতের ১২ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বিচার বিভাগে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত সমস্যা ও তা হতে উত্তরণের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে বিচার প্রাপ্তি আরও সহজ করতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বক্তব্য শেষে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল বিচারকদের প্রতি দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এবং সেগুলোর কার্যকর সমাধানে গ্রহণীয় পদক্ষেপ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন ও অনুপ্রেরণাদায়ক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সকলকে বিচার বিভাগের প্রতি যাতে দেশের জনসাধারণের আস্থা সমুন্নত থাকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। বক্তব্যের শেষে বিচারকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন এর ব্যাপারে তিনি কাজ করে যাবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। প্রথম দিনের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য তৈরি পিডিএস ডাটাশীট সফটওয়্যার এর শুভ উদ্বোধন এবং কনফারেন্স উপলেক্ষ্য সুপ্রীম কোর্ট হতে প্রকাশিত একটি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য তৈরি "ই-এপ্লিকেশন সফটওয়্যার" এর শুভ উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে উদ্বোধনী অধিবেশন, একটি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন ও চারটি বিষয়ভিত্তিক কর্ম-অধিবেশন ও সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচাপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা। প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে বিচারকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ ও প্রাণচাঞ্চল্যের প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন পদক্ষেপে অধস্তন বিচারালয়ে যে উন্নততর কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার ধারা অব্যাহত থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে 'আইনগত সহায়তা প্রদানে সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও পারস্পরিক সহযোগিতা' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস (সিএলএস) এর ডেপুটি টিম লিডার বেগম ফাতেমা রশীদ হাসান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন সরকারের আইনগত সহায়তা কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নে সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্ম-অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মাননীয় বিচারপতি জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী। অধিবেশনে আলোচনার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে আদালত প্রশাসন ও কর্মচারীদের দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধে আদালত প্রশাসনের স্বচ্ছতা, নির্দিষ্টতা ও সাদৃশ্যের উপর জোর প্রদান করা হয়। এছাড়াও বক্তারা নতুন বিচারক ও কর্মচারী নিয়োগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতা, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা আধুনিকায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

"নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক কর্ম-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বক্তব্য রাখেন হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার। অধিবেশনে অলোচকগণ উক্ত আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন যার মধ্যে রয়েছে মিথ্যা অভিযোগের আধিক্য, দাম্পত্য সম্পর্ক হতে উদ্ভূত একগুচ্ছ মামলা, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সারাদেশে সাদৃশ্যের অভাব, ছেলে শিশুদের যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে প্রতিকারহীনতা ইত্যাদি। এছাড়াও আলোচনায় সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রত্যেক সমস্যার জন্য পৃথকভাবে সুপারিশ গৃহীত হয়। অধিবেশনে আইনের কিছু ধারা আপসযোগ্য করা, পূনর্বাসনমূলক আইনগত সহায়তা প্রদান এর বিধান প্রণয়ন করা, শাস্তি ও শিশুর বয়সের ক্ষেত্রে সমতা সাধন করা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়।

দিনের ৩য় কর্ম-অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার বিষয়ে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আশফাকুল ইসলাম। অধিবেশনে বক্তারা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুন্যাল এর দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় অংশে বিধিমালা প্রণয়ন, অ্যাপিল্যাট ট্রাইব্যুন্যাল প্রতিষ্ঠা, মামলার অনুপাতে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রতিকার এর সুপারিশ করা হয়।

"বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে বাধা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক ৪র্থ কর্ম-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব সৌমেন্দ্র সরকার। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ফারজানা ইয়াসমিন। অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলাজট নিরসনে এডিআর প্রয়োগের সফলতা, বাংলাদেশের আইনে এডিআর এর প্রতিফলন, এডিআর প্রয়োগে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৯ক ধারার অধীনে এডিআর প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয়। বক্তারা সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, গণসচেতনতা সৃষ্টি, মধ্যস্থতাকারী আইনজীবীদের ফি বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং এ সম্পর্কে বিধিমালা প্রণয়ন এর সুপারিশ করেন। এছাড়াও বক্তারা ফৌজদারি কার্যবিধিতে এডিআর সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ এর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা। তিনি বিচারকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সততা ও নিষ্ঠার সাথে এবং নির্ভীকভাবে কাজ করার জন্য বিচারকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন-২০১৬ এর দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনা ও দিক নির্দেশনা অধস্তন আদালতের প্রশাসন ও বিচারকার্য পরিচালনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এরই মাধ্যমে সমাপ্ত হয় দুই দিন ব্যাপী জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন-২০১৬।

উদ্বোধনী অধিবেশন

অধিবেশনের প্রধান অতিথি ঃ **মাননীয় বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা**
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি

অধিবেশনের সভাপতি ঃ **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মিঞা**
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি

বিশেষ অতিথি ঃ **মাননীয় বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী**
বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি
জনাব শামসুর রহমান শরীফ
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়
জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল **জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম**। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য Community Legal Service (CLS) এবং যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সংস্থা Department For International Development (DFID) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন বিচার বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন বিচারকের স্বল্পতা, বিচারকসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের অভাব, সেকেলে আইন সংস্কার, অবকাঠামোগত সমস্যা, তথ্য প্রযুক্তির স্বল্পতা ও সীমিত প্রয়োগ, সহায়ক কর্মচারীর অপ্রতুলতা, নিরাপত্তাহীনতা, যানবাহন সংকট, অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি দূরীকরণে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা করবেন।

প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর সদস্য সিনিয়র জেলা জজ **জনাব গোলাম মর্তুজা মজুমদার** অধস্তন আদালতের বিচারকদের পক্ষে এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে বিচার বিভাগীয় সম্মেলনকে বিচারকদের মিলনস্থল ও ভাব বিনিময়ের স্থান বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারকর্ম বিভাগের কাজে গতি এসেছে। তিনি অতিরিক্ত জেলা জজ, যুগ্ম-জেলা জজ ও সিনিয়র সহকারী জজ পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত বিচারকগণ পদোন্নতির স্কেলে বেতন না পাওয়ার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি অতিরিক্ত জেলা জজদেরকে সার্বক্ষণিক গাড়ীর প্রাধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান, সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজ পর্যায়ের বিচারকগণকে স্টেনোগ্রাফার প্রদান করা, ঢাকায় আগত বিচারকদের স্বল্প কালীন অবস্থানের জন্য বিচার বিভাগীয় রেস্ট হাউজ স্থাপন, বিচারকদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ রাখার জন্য প্রতি জেলায় স্পোর্টস্ এন্ড রিক্রিয়েশন সেন্টার স্থাপন করা, বছরের যে কোনো সময় বিচারকদেরকে বদলী না করে বছরের শেষে বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বদলী করার নীতি প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। তিনি পদোন্নতির জন্য বিচারিক অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করার মাধ্যমে বদলী ও পদোন্নতিতে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব দূরীকরণার্থে দ্রুত গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রত্যাশা করেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্য হতে অন্যূন পঞ্চাশ ভাগ বিচারক নিয়োগের দাবী জানান। তিনি অধস্তন আদালতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও মাননীয় আইন মন্ত্রীর সমন্বয়ে প্রতি মাসে একবার করে গণশুনানী অনুষ্ঠানেরও সুপারিশ করেন।

জনাব আনির চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এডভাইজার জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে "বিচার বিভাগীয় বাতায়ন" এর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "জনগণের দোরগোড়ায় সেবা" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটুআই প্রোগ্রাম

কাজ করে যাচ্ছে। সেবা প্রদান সহজীকরণের জন্য সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে পাঁচ হাজারের অধিক ডিজিটাল সেন্টার ও ৮৫০০-এর মত পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি মাসে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এর সেবা নিচ্ছে। জাতীয় তথ্য বাতায়ন বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সরকারী বাতায়ন এবং এই বাতায়নে ৪৩ হাজারেরও বেশী সরকারী অফিস যুক্ত আছে।

এটুআই হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের সংজ্ঞা তৈরী করা হয়েছে। সরকারী সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের সময় (Time), খরচ (Cost) ও যাতায়াত (Visit) বা TCV কমানোই উদ্ভাবন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ইতোমধ্যে সেবা খাতে জনগণের সময়, খরচ ও যাতায়াত কমিয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মামলা ভূমি হতে উদ্ভূত। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও এটুআই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড্ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম তৈরীর মাধ্যমে বিচারিক ক্ষেত্রে এটুআই-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ ও জনবান্ধব করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের ১৯ এপ্রিল এটুআই এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ইউএনডিপি-র সাহায্যপুষ্ট JUST প্রকল্পের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং এটুআই এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় এটুআই বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এবং আইন ও বিচার বিভাগের সহায়তায় বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখ বিচার বিভাগীয় বাতায়নের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসে বা যে কোনো ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রয়োজনীয় বিচারিক তথ্য পাবে। বিচার বিভাগীয় বাতায়নে জনগণ যাতে ঘরে বসে মামলার সকল তথ্য পেতে পারে, সেজন্য সকল অধস্তন আদালতের কজ লিস্ট সিস্টেম তৈরী করা হচ্ছে। দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য নিবিড় মনিটরিং এর প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় মনিটরিং ড্যাশবোর্ড তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় কুখ্যাত আসামীদের আদালতে না এনে কারাগারে রেখে সাক্ষ্য গ্রহণের সুবিধার্থে কারাগার ও আদালতের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও আদালত হতে প্রদানকৃত অন্যান্য সেবা সহজীকরণের জন্য পর্যায়ক্রমে ডিজিটাইজেশনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এই সকল ই-সেবা তৈরীর ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সহায়তা করছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়ার জন্য সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের Annual Performance Agreement এর একটি বড় অংশ সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ। বিচার বিভাগ এ দিক থেকে এগিয়ে আছে এবং সিলেট ও কক্সবাজারে সহজীকরণের মহড়া পাইলট আকারে চলছে। তিনি বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান।

জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের পূর্বের সরকার যে নির্বাচনী ইসতেহার প্রচার করে, তাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার ছিল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো। তরুণদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। তিনি বলেন, বিচারিক কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য ইউএনডিপি-র সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩০ লক্ষ মামলা বিচারাধীন। বিদ্যমান জনবল দিয়ে সেটা রাতারাতি নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলা নিষ্পত্তি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো Philosophy of revolution। এর আওতায় শুরুতে ১০ টি জেলায় পাইলট প্রজেক্ট এর জন্য ডিপিপি তৈরি করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাইলটিং এর পরিবর্তে সকল জেলার সকল কোর্টরুমকে ই-কোর্টরুমে রূপান্তরিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ফলে প্রকল্পের বাজেট প্রথমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হলেও পরবর্তীতে এটি ১৬৬৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ই-জুডিসিয়ারীর জন্য ১৪০০ ই-কোর্ট রুম স্থাপন করা হবে। রায় ও রেকর্ড ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে। এর আওতায় রেকর্ডরুম অটোমেশন, ডিজিটাল আর্কাইভস্, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ, বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স সিস্টেমসহ বিচারকদেরকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিচার কেবল করলেই চলবে না, বিচার যে করা হয়েছে তা দৃশ্যমানও হতে হবে। তিনি জামিন ও রিমান্ড মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিচারকদেরকে স্বাধীনভাবে সাহসিকতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানান।

তিনি বলেন, পুলিশের কথায় রিমান্ড দেয়া যাবে না। বিচারকরা কারও কথায় নয়, বরং আইনের কথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আইন অন্ধ হতে পারে, কিন্তু বিচারক অন্ধ হতে পারেন না। কাউকে খুশী করা বিচারকদের কাজ নয়। সাহস না থাকলে বিচার বিভাগে কাজ করা যাবে না। সুপ্রীম কোর্টকে অধস্তন আদালতের বিচারকদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট বিচারকদেরকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষা দিলে বিচারকগণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন এবং তাদেরকে অপরিণত বদলীর আশংকায় থাকতে হবে না। নিম্ন আদালতের বিচারকগণ বদলীকে ভয় পান। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় ও জেলা শহরে কর্মরত বিচারকদেরকে তিন বছরের আগে বদলী করা উচিত নয়। আইনজীবী সমিতির বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করতঃ ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনজীবীদের অভিযোগ বিনা তদন্তে আমলে নেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, সরকারের স্বার্থ আছে, এমন মামলায় জামিন ও রিমান্ড এর বেশী অপব্যবহার হয়। বিচারকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে হবে। বিচারকদেরকে বদলীর পূর্বেই নোটিশ দিতে হবে, যাতে বিচারকগণ তাদের কাজ শেষ করতে ও বদলীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারেন। বিচারকের সংখ্যা প্রয়োজন মোতাবেক বৃদ্ধি না করে বিচারকগণ কাজ করেন না, এমনটি বলা যাবে না। বিচারকদের বেতন নিয়ে হয়রানি কাম্য নয়। পদোন্নতির সাথে সাথে বিচারকদের বেতনও দিতে হবে। বিচারকদের অপ্রয়োজনীয় প্রেষণে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। ফৌজদারি মামলায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য পুলিশের পৃথক ও স্বাধীন তদন্ত সংস্থা করতে হবে।

অন্যতম বিশেষ অতিথি **জনাব শামসুর রহমান শরীফ** মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তুলে ধরে বলেন, স্বাধীনতার অন্যতম চেতনা ছিল আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। এই জন্য বিচার বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বিচার বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজনের জন্য সুপ্রীম কোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সফলতা কামনা করেন।

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা, এ অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত বক্তব্যে সর্বাগ্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের **১১১** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রিমান্ড বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় যথাযথভাবে অনুসরণ করে সকল বিচারককে কাজ করতে হবে। তিনি দেওয়ানী জারী মামলা নিষ্পত্তিতে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব এড়ানোর জন্য বিচারকদেরকে আরও সচেতন হওয়ার আহবান জানান। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে অপরাধ আমলে নেয়ার সময় আরও অধিক মনযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। বিচারকদেরকে যথাসময়ে এজলাসে আসনগ্রহণসহ এজলাস সময়ের কার্যকর ব্যবহারের নির্দেশ দেন। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ঘাটতি থাকলেও বিচারকদেরকে এর মধ্যেই যথাযথভাবে কাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বিচারকদের নিকট হতে পক্ষপাতিত্বহীন ও সৎ সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করেন।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্হা এ অধিবেশনে "বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন" এর শুভ উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব জে.এন. দেব চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে "বিচার বিভাগের অগ্রযাত্রায় সুপ্রীম কোর্ট" শীর্ষক একটি প্রামাণ্য চিত্র এবং বিচার বিভাগে ডিজিটাইজেশনের সুফলের উপরে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি **বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা** তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সকলকে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরীকে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল বিচারকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন- যেখানে শোষিত, নির্যাতিত এবং অসহায় মানুষ স্বল্প খরচে দ্রুত ন্যায়বিচার পাবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্বাধীন বিচার বিভাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ সীমিত সম্পদ ও বাজেটের মধ্যে নিরন্তর দায়িত্ব পালন করে চলেছে। একটি দেশের বিচার বিভাগের দক্ষতা এবং দ্রুত বিচারের ওপর ভিত্তি করে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি, বিচার বিভাগের কর্ম দক্ষতার ওপর একটি দেশের সভ্যতার মাপকাঠি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তিনি বলেন, কোনো দেশের সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপ করার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে সেই দেশের বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা।

দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করতে বিচার বিভাগের অবদানের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচার বিভাগের অবদান অন্য কোনো বিভাগের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিচার বিভাগ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার সম্পন্ন করেছে। কারা অন্তরালে নৃশংসভাবে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা, ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধ, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন জেএমবির নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও বিচারক হত্যা এবং ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার মাধ্যমে সব ধরনের সন্ত্রাস ও অপরাধের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ জিরো টলারেন্স দেখিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন সুদৃঢ় করেছে। পূর্বতন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অল্পকয়েক দিনের মধ্যে সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যা মামলা কোন আদালতে বিচার হবে সে নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত এর উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান দিয়েছে। ফলে এই জঘন্য অপরাধের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন রাষ্ট্রের মূলভিত্তি জনগণের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পরিচয় খর্ব করায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত তা অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। এর ফলে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেশের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী এবং সপ্তম সংশোধনী বাতিল করে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে। পবিত্র সংবিধান থেকে সামরিক আইন তথা সামরিক শাসকদের সংশোধিত ও সন্নিবেশিত বিধানসমূহ মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। বিচার বিভাগের এই আদেশের ফলে সামরিক শাসনের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার সুযোগ পরাহত হয়েছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, আপীল বিভাগ কতিপয় মামলায় আইনের কতগুলো অমীমাংসীত বিষয়ে এবং বিচারকদের আচরণবিধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। যেমন, Syed Shahidur Rahman (C.A No. 145 of 2005) মামলায় বিচারকদের আচরণ বিধিমালার বিষয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। Civil Appeal No. 159 of 2010 (এর সঙ্গে আরো ১৬টি মামলা যুক্ত) মামলায় এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, সরকারী কর্মচারীগণ তাঁদের সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো রীট মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে না। তাঁদেরকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অবশ্যই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। BLAST & Others Vs. Bangladesh & Others, 1 SCOB (AD) 1 মামলায় আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছে, আইনে বাধ্যতামূলক মৃত্যুদন্ডের বিধান থাকলেও বিচারিক আদালত বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করতে পারবে। Bangladesh v. BLAST (Civil Appeal No.53 Of 2004) মামলায় আপীল বিভাগ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার এবং ১৬৭ ধারা অনুযায়ী রিমান্ড বিষয়ে আদালত এবং পুলিশ প্রশাসনকে পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অবকাঠামোগত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একটি ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়ে যাত্রা শুরু করে। তীব্র অবকাঠামোগত সমস্যা ও নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্রুত ও গুণগত বিচার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার ফলে বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা ক্রমশঃ বাড়ছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় দীর্ঘ ০৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোগত স্থাপনা নির্মিত হয়নি। ৪২ টি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেসি বিল্ডিং নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি জেলায় বিল্ডিং আংশিক হস্তান্তর করা হয়েছে। ৮টি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেসি বিল্ডিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও ফার্নিচারের অভাবে তা এখনও ব্যবহার উপযোগী হয়নি। ২১টি জেলায় বিল্ডিং নির্মাণের কাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। ৯ টি জেলায় বিল্ডিং নির্মাণ এর কাজ এখনো শুরুই হয়নি। অধিকন্তু, ২৫টি জেলা জজ আদালতের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৭০ জন বিচারককে এজলাস ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে বিচারিক কর্মঘন্টার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। যা মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাছাড়াও, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মালখানার এবং পুলিশের অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকায় বিচার কার্যক্রমে বিঘ্ন হচ্ছে।

বিভিন্ন জেলা আদালত পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, নির্মাণ কাজে গতি সঞ্চারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তিনি প্রত্যেক জেলার জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করলেও নির্মাণ কাজের আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়নি। কোনো কোনো জেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সমন্বয়হীনতার জন্য পাওয়ার হাউজ, সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়নি ইত্যাদি অজুহাতে নির্মিত ভবনেও বিচারকার্য পরিচালনা করার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক টেন্ডারে এ সকল বিষয় বিবেচনা না করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজের ব্যয় বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির অজুহাতে সংশোধিত বরাদ্দ চায়। এতে নির্মাণ কাজের গতি ব্যাহত হয়। যা কোনো মতেই কাম্য নয়। সর্বোপরি, অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা, নির্বাহী বিভাগের আন্তরিক সহযোগিতার অভাবে নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগ তথা পদায়ন করা যাচ্ছে না। অধিকন্তু, বিচার বিভাগের আধুনিকায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

আইন মন্ত্রণালয়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের প্রশাসনিক ও মন্ত্রণালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা কম মর্মে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, এই বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে কর্মরত থাকেন। বিচারকদের মধ্যে প্রশাসনিক কাজে যারা দক্ষ তাদের দিয়ে প্রশাসন চালাতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিল্ডিং নির্মাণের সময় বিচারকদেরকে জড়িত করা হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দিতে হবে। বিল্ডিং নির্মাণে সমন্বয়হীনতার ফলে নির্মাণ কাজ তেমন অগ্রসর হয়নি। একজন বিচারককে যদি টেন্ডারবাজীতে ঢোকানো হয় তবে সে আর বিচারক থাকবে না। সে ব্যবসায়ী কিংবা অর্থলোভী হয়ে পড়বে। বিচারকেরা যদি বড় ধরনের কেনা-কাটার সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে বিচারক হিসেবে তাঁর সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়, সে আর বিচারক থাকে না।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, ২ বছর আগে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের সময় ম্যাজিস্ট্রেসী বিল্ডিং নির্মাণকার্য যে অবস্থায় ছিল, তাঁর শত চেষ্টার ফলেও এখনও সেই অবস্থা-ই বিরাজ করছে। তিনি বলেন, আদালতের স্থান সংকুলানের তীব্র সংকটের বিষয়টি তিনি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নজরে এনেছেন। তা সত্ত্বেও কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়নি।

২০০৭ সালের ১ নভেম্বরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী পৃথকীকরণের পর ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, ২০০৭ সালে ২ মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৮৩,০৯১ টি এবং ২০০৮ সালে ৪,৪২,৭২৫ টি, ২০০৯ সালে ৪,৬২,২৩৫ টি, ২০১০ সালে ৭,০৯,১১২ টি, ২০১১ সালে ৬,৭১,৬২৮ টি, ২০১২ সালে ৭,২৫,৫২৩ টি, ২০১৩ সালে ৬,৬২,০২২ টি, ২০১৪ সালে ৭,৩৪,৩৫৯ টি এবং ২০১৫ সালে ৮,৪৭,৩৯৮ টি। ২০১৬ সালে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৬,৮২,০৮৫ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, জনবল ও অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা

নিশ্চিত করা গেলে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেত।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি তথ্য প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, মামলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এবং দক্ষ সেবাদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। সফটওয়্যারের সহায়তায় কোনো মামলার তথ্য এখন সার্চ কমান্ড দিয়ে বের করা সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ সুবিধাগুলো ব্যবহার করে সকল নাগরিকের কাছে তাদের পছন্দের ডিভাইসে মামলার তথ্য পাঠানোর কাজটিও নিশ্চিত করা কঠিন কাজ হবে না। সুপ্রীম কোর্ট তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে। বিচার ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনের পথে এরই মধ্যে কিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং a2i এর যৌথ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। বিচার বিভাগের জন্য মনিটরিং ড্যাস বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে ই-কোর্ট ব্যবস্থা চালু, ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড ধারণ ও সংরক্ষণ, জেলা ভিত্তিক ও কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের সুবিধা চালু, দেশের বিচার ব্যবস্থায় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রচলন এবং বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের তিন বছর মেয়াদি ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে বহুদূর এগিয়েছে।

নিম্ন আদালতসহ সুপ্রীম কোর্টে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মর্মে উল্লেখ করে বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪০০ কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু Pre-ECNEC মিটিং এ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর কয়েকজন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে Pre-ECNEC এ পাশ হওয়ার পরও একই মন্ত্রণালয় বিগত ৩১শে অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের পত্রে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রেরণ স্থগিত রাখার অনুরোধ করে। বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজড করার জন্য উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে শুরু করার বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাইজেশন এর স্বপ্ন অনেকটাই অপূর্ণ থেকে যাবে।

বিচার বিভাগে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের বর্ণনা করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে অধস্তন আদালতের বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে e-Application software চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং আগামী ১ জানুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সারাদেশে এর কার্যক্রম শুরু হবে। এই e-Application software ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারকদের ছুটির প্রয়োজন হলে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সফট্ওয়ারে প্রবেশ করবেন, ছুটির কারণ ও সময় লিখে অনুমতি চাইলে রেজিস্ট্রার জেনারেল এর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যাবে। নতুন এ পদ্ধতির মাধ্যমে ছুটির এ ব্যবস্থা হওয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে ছুটির বিষয়টি জানা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কতদিন ছুটিতে থাকছেন এ বিষয়ে হিসাব রাখা সহজ হবে। এতে করে অধস্তন আদালতের বিচারকদের ভোগান্তি কমবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী একটি জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার বিধান থাকলেও বর্তমানে দেশের ৪৬টি জেলায় ৫৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। ১৮টি জেলায় জেলা ও দায়রা জজগণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১,৫৫,০৩৩ টি। এমতাবস্থায় আরো অধিক সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা অতীব জরুরী। অন্যথায় উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, বিশেষ আদালতসমূহে স্থান সংকুলানের তীব্র অভাব রয়েছে। প্রায়শঃই সরকার নতুন আইন করে বিভিন্ন ধরনের ট্রাইব্যুনাল যেমন-নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, স্পেশাল জজ, পরিবেশ আদালত, পরিবেশ আপীল আদালত, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি ট্রাইব্যুনাল গঠন করলেও এ সকল ট্রাইব্যুনালের জন্য কোনো পৃথক আদালত ভবন, পরি-কাঠামো নির্মাণ এবং রেকর্ড রুম ও বসার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত জরাজীর্ণ ভবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিচারকার্য চলছে। ফলে দ্রুত বিচার সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ আদালতে পৃথক রেকর্ড রুম না থাকায় রেকর্ড সংরক্ষণে তীব্র অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিচারক স্বল্পতার বিষয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন যে, আমেরিকায় ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ১০৭ জন, কানাডায় ৭৫ জন, ইংল্যান্ডে ৫১ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ জন, ভারতে ১৮ জন বিচারক রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে ১০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১০ জন বিচারক রয়েছে। জনসংখ্যা এবং মামলার সংখ্যা অনুপাতে বিচারক নিয়োগ প্রদান করা এখন সময়ের দাবী। বর্তমানে আপীল বিভাগে ৯ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৮৯ জন বিচারকের মধ্যে ৩ জন বিচারক International Crimes Tribunal এ বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে ৪ জন বিচারক গুরুতর অসুস্থ। ফলে বিভিন্ন সময় বেঞ্চ গঠনে হিমশিম খেতে হয়। এদের মধ্য হতে ২০১৭ সালে ৭ জন বিচারক অবসর গ্রহণ করবেন। ফলে বেঞ্চ গঠনে জটিলতা আরো প্রকট হবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে আইন মন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তিনি ৮ জন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এ সুপারিশ প্রেরণ করা হলেও দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এ নিয়োগ প্রক্রিয়া আলোর মুখ দেখেনি।

নিম্ন আদালতে বিপুল সংখ্যক পদ শুন্য আছে মর্মে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, নিম্ন আদালতের বিচারকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১৬৫৫; এর মধ্যে ৩৮৭ টি পদ শূন্য রয়েছে। অবশিষ্ট ১২৬৮ জন বিচারক দ্বারা ২৭ লক্ষাধিক মামলা নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে। সময়মত আইন মন্ত্রণালয় হতে রিকুইজিশন না দেয়ায় বিচারক নিয়োগ বিলম্বিত হয়। বিদ্যমান বিচারক সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলে মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তির মধ্যে ব্যবধান বহুলাংশে কমে আসবে মর্মে মাননীয় প্রধান বিচারপতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বলে উল্লেখ করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, নিম্ন আদালতের বিভিন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে সৎ, দক্ষ ও মেধাবী বিচারক নিয়োগ দিতে চাইলেও তাতে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

দেশের বিভিন্ন দায়রা আদালতে Negotiable Instruments Act, ১৮৮১ এর অধীনে দায়েরকৃত হাজার হাজার মামলা বিচারাধীন আছে। ফলে দায়রা আদালতগুলো হত্যা, ডাকাতি তথা অন্যান্য **গুরুতর** অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি না করে উক্ত আইনের মামলাগুলোর বিচার কার্যে নিবিষ্ট থাকে। সংগত কারণে, উক্ত আইনে মামলাগুলো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য এবং উক্ত আইনের অপরাধ আপোসযোগ্য করা হলে মামলা নিষ্পত্তির হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ফরমস্ এন্ড স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট দেশের দেওয়ানী, ফৌজদারি ও ট্রাইব্যুনালসহ অন্যান্য আদালতের ব্যবহার্য ফরমস্ চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে বিচারকার্যে বিঘ্ন ঘটছে। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এই প্রকট সমস্যা দূরীকরণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘদিন সাক্ষী না আসার ফলে ঝুলে থাকা ফৌজদারি মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭১(২) ধারা অনুযায়ী সাক্ষী হাজির করার দায়িত্ব পুলিশের। মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারকদেরকে Criminal Rules and Orders Vol. I-এর Chapter ৩৩ এর Rules ৬৩৮(২) ও (৩) এর নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিচারকগণ *Kamar Ali v. Abdul Mannaf, 39 DLR (HCD) 319* এবং *Md. Taher Uddin v. Abul Kashem & Others, 37 DLR (HCD) 107* মামলায় উল্লেখিত নীতিমালা অনুসরণ তথা সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফৌজদারি কার্যবিধির 265H অনুযায়ী আসামীকে খালাস দিতে পারেন। সকল প্রসেস জারী করার পরও সাক্ষী হাজির না হলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৯ ধারায় মামলার কার্যক্রম বন্ধ করে আসামীদের রিলিজ করতে পারেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত কারাবন্দীদের অর্থদন্ড পরিশোধ সহজীকরণ করার বিষয়ে গত ০২/০৯/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগ হতে ০৫/২০১৬এ নম্বর সার্কুলার জারী করা হয়। এতে

কারাবন্দীদের অর্থদন্ড পরিশোধে ভোগান্তির পরিমাণ বহুলাংশে লাঘব হবে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশের সকল আদালতে চলমান মামলাজট নিরসন ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সময় সময় সার্কুলার/Practice Direction ইস্যু করা হয়েছে এবং হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন। জুডিসিয়াল কনফারেন্স এবং পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে সার্কুলার জারী করা হয়েছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতির ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সুপ্রীম কোর্টের নিরবিচ্ছিন্ন মনিটরিং এবং প্র্যাকটিস ডিরেকশন ইস্যুর ফলে বিচারকদের মধ্যে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির স্পৃহা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সকল আদালতে ২০১৪ সালে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৩,০৪,৫৪৪টি মামলা এবং ২০১৫ সালে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৪,২৬,৬৭৬টি মামলা। উচ্চ আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৪,২৭,১৫৪ এবং নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৭,১২,১২১। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বর্তমানে ৯৮ জন (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৩ জন সহ) বিচারক কর্মরত আছে। নিম্ন আদালতে ১৫০০ বিচারকের মধ্যে প্রেষণ ব্যতীত কেবল ১৩০০ বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করছে। এত অল্পসংখ্যক বিচারক দ্বারা ৩০ লক্ষের অধিক বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে। সংগত কারণে বর্তমানে নিম্ন আদালতের শূন্য পদসমূহে দ্রুত বিচারক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া কমপক্ষে বিদ্যমান বিচারক সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই মর্মে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচারক ও বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আধুনিক প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দেয়ার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক মানের National Judicial Academy স্থাপন করা প্রয়োজন। National Judicial Academy স্থাপনের পটভূমি, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা সবিস্তারে উল্লেখপূর্বক সাভার, কেরানীগঞ্জ অথবা গাজীপুরে কমপক্ষে ২৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করার জন্য বিগত ২২/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি আশাব্যঞ্জক কোন ফল পাওয়া যায়নি। এছাড়া Judicial Administration Training Institute (JATI) এর সম্প্রসারণ করে এখানে অন্ততঃ ১০০ জন বিচারককে একই সময়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, JATI বিল্ডিং-এ মহিলা ও পুরুষ বিচারকদের জন্য পৃথক ডরমেটরি, আধুনিক লাইব্রেরী, ইনডোর এবং আউটডোর গেম এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। JATI বিল্ডিং এর সংলগ্ন PWD এর সংশ্লিষ্ট প্লটসহ আবদুল গণি রোডে অবস্থিত আইন মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন জায়গা JATI বিল্ডিং সম্প্রসারণের জন্য অপরিহার্য। উক্ত জায়গা JATI এর অনুকূলে হস্তান্তর করার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রায় তিন বছর পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, বিচার সংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক স্মারকসমূহ সংগ্রহ করে সুপ্রীম কোর্ট জাদুঘরে রাখা প্রয়োজন এবং সুপ্রীম কোর্ট এর একটি নিজস্ব আর্কাইভ থাকা আবশ্যক। কিন্তু স্থান সংকুলানের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। সীমিত পরিসরে সুপ্রীম কোর্ট জাদুঘরে ঐতিহাসিক স্মারকসমূহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৩০শে জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের পরে পুরাতন হাইকোর্ট ভবন হতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলেও এর কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, জেল হত্যা মামলা, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা, একুশে আগস্ট গ্রেনেড হত্যার মতো মর্মান্তিক মামলাগুলো যদি জেলা আদালতে হতে পারে তাহলে যুদ্ধাপরাধীর মামলার বিচার সুপ্রীম কোর্ট অঙ্গনের বাইরে হতে কোনো অসুবিধা নাই। সুপ্রীম কোর্টে বিচারকদের বসার জায়গার সংকট রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে কোনো প্রশাসনিক ভবন নাই। সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ডে কেয়ার সেন্টার এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট মেডিক্যাল সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার তীব্র সংকট রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে পুলিশ ব্যারাকের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। ফলে সুপ্রীম কোর্টের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। পুরাতন হাইকোর্ট ভবন হতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হলে সুপ্রীম কোর্টের তীব্র অবকাঠামোগত সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। এ বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আবারো অনুরোধ করেন।

আদালত ও বিচার ব্যবস্থাকে Temple of Justice এর সাথে তুলনা করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচার প্রক্রিয়ায় ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু বিচার ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের মনে আস্থা তৈরি করতে হবে এবং এতে জনগণের আস্থা থাকতে হবে। সুপ্রীম কোর্টে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যেখানে এসে একজন বিচারপ্রার্থী

মানসিকভাবে বিচার বিভাগ সম্পর্কে একটা ইতিবাচক ধারণা পোষণ করবে। এ ধারণা তৈরি প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রীম কোর্ট এর একার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিটি নিম্ন আদালতের পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বিচারপ্রার্থী জনগণ আদালত অঙ্গনে প্রবেশ করার সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তার বিশ্বাস এবং আস্থার মাত্রা বেড়ে যায়। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন আদালতে হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী আসে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রামাগার ও শৌচাগার নাই। মহিলাদের জন্য পৃথক কোনো টয়লেট এর ব্যবস্থা নাই। সাক্ষীদের জন্য বসার স্থান নাই। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও বিশ্রামাগার জরুরী ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর সদ্য সমাপ্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, সুপ্রীম কোর্টের ইতিহাসে এই প্রথম সুপ্রীম কোর্ট ও এশিয়ান ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক দুই দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২৫-২৬ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ হোটেল রেডিসনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বিচারক, পরিবেশ বিশেষজ্ঞের একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন দেশের আদালত, পরিবেশ এবং জলবায়ু সংরক্ষণে গৃহীত ভূমিকা, পদক্ষেপ এবং উহা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এতে বিচারকদের মধ্যে পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্পর্কে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া এতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

দুর্নীতি রোধে বিচার বিভাগের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা কেবলমাত্র বিচার বিভাগই তৈরি করে। দেশের গত ২/৩ বছরে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তার পিছনে বিচার বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখিয়েছে বিচার বিভাগ। সুপ্রীম কোর্ট দুর্নীতির মামলা থেকে শুরু করে, স্বর্ণ চোরাচালান সব ধরনের মামলাতে কোনরকম ছাড় দেয়নি। ইনকাম ট্যাক্সসহ রেভিনিউ সংশ্লিষ্ট যত মামলা ছিল সবগুলোতেই রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশাল অবদান রেখেছে বিচার বিভাগ। কখনও নিম্ন আদালত থেকে দুর্নীতি বা চোরাচালান এর আসামীদের জামিন হলেও সেগুলো যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাতিল করেছে উচ্চ আদালত। এভাবেই বিচার বিভাগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সব সময় অবদান রেখে আসছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের উপর যতটুকু দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অর্পণ করেছে বিচার বিভাগ শুধু ততটুকুই করবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৬ আয়োজন ও বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছে তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরুর পূর্বে হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি **জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরী** বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারপতিগণ ও অধস্তন আদালতের বিচারকদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। বক্তব্যের সূচনাতে তিনি বিচার বিভাগ কে অভিহিত করেন সরকারের উৎকর্ষের নির্ণায়ক ও সভ্য সমাজের নির্দেশক হিসেবে। বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা বাড়াতে বিচারকগণের সাথে সাথে আইনজীবী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরও এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি প্রচলিত ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার সেকেলে অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে বিচার বিভাগের আধুনিকিকরণ এর উপর জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন, একজন আধুনিক বিচারক একই সাথে তাঁর আদালতের প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও পর্যবেক্ষক। তিনি বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে বন্ধুবৎসল শাসন বিভাগের প্রত্যাশা প্রকাশ করেন। বক্তব্যের শেষে তিনি বিচারকগণ ও আইনজীবীদের একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলে উল্লেখ করেন এবং বিচার বিভাগের নৈতিক ভিত্তি জোরদারের জন্য বিচারকগণ ও আইনজীবীদের যৌথ ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ এর উদ্বোধনী অধিবেশন

উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা

বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী

বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা

আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি 'বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন' এর শুভ উদ্বোধন করছেন

আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ এবং এটর্নী জেনারেলসহ সম্মেলনে উপস্থিতির একাংশ

সমাপনী অধিবেশন

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৬ এর ১ম দিনের সমাপনী অধিবেশনে দেশের অধস্তন আদালতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১২ (বারো) জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁরা বিচার বিভাগে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ হতে উত্তরণের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে বিচার সেবা প্রাপ্তি আরও সহজিকরণের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিচারকগণ বক্তব্য প্রদান করেনঃ

১। জনাব তরিকুল ইসলাম, সহকারী জজ, খুলনা

২। বেগম সোনিয়া আহমেদ, সিনিয়র সহকারী জজ, ময়মনসিংহ

৩। জনাব সুদিপ্তা সরকার, যুগ্ম জেলা জজ, ময়মনসিংহ

৪। জনাব সুমি আহমেদ, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা

৫। জনাব শরীফ মোঃ সানাউল হক, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, গাজীপুর

৬। জনাব এস কে এম তোফায়েল হাসান, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা

৭। জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা

৮। বেগম শামীমা আফরোজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী

৯। জনাব কামরুল হোসেন মোল্লা, মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা

১০। জনাব এস এম কুদ্দুস জামান, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা

১১। জনাব মোঃ শাহজাহান, যুগ্ম-সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন

১২। জনাব মনির আহমেদ পাটোয়ারী, জেলা ও দায়রা জজ, সিলেট

অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বক্তব্য শেষে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সকল বিচারকদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বক্তাগণ কর্তৃক উদ্ধৃত সমস্যাবলী সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

সমাপনী অধিবেশনের উন্মুক্ত বক্তব্য পর্বে অধস্তন আদালতের বিচারকবৃন্দ উল্লেখ করেনঃ-

দেশের আদালতসমূহে বিরাজমান তীব্র এজলাস সংকট ও একই বিচারকের উপর একাধিক কোর্ট এর দায়িত্ব আরোপিত থাকার বিষয়টিসহ সকল বিদ্যমান সমস্যা যতদ্রুত সম্ভব সমাধান করা প্রয়োজন। তাঁরা আরো উল্লেখ করেন;

- সহকারী জজদের জন্য স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন, কেননা তাতে একজন বিচারক বর্তমানের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী মামলা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবে।
- বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনকে অর্থবহ করতে দেশের সকল আদালতে নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।
- সহকারী জজ পর্যায়ে পদ বৃদ্ধি ও নিয়মিত নিয়োগ প্রদান; বিশেষ করে নতুন উপজেলা গঠিত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত উপজেলার জন্য সহকারী জজ পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরণ করা প্রয়োজন।
- এজলাস ও খাস কামরা সংকট দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- সহায়ক কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ শূন্য পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন।
- বিচারকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং পুরাতন আইনের সংস্কার করা প্রয়োজন।
- বিচারকদের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিচারকের জন্য এ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সারা দেশের আদালতসমূহে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা।
- সারাদেশে ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়ন করা।
- সম পদমর্যাদার অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের অনুরূপ সেবা ও সুবিধা (নিজস্ব গাড়ী, গাড়ী ক্রয় ঋণ ইত্যাদি) চালু করা।
- বিচারাঙ্গনে বিদ্যমান এজলাস সংকট নিরসন।
- প্রতি জেলায় বিচারকদের নিজস্ব আবাসন এর ব্যবস্থা ও পদোন্নতির সাথে সাথে উক্ত পদের বেতন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- মামলাজট নিরসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ।
- সকল আদালতের বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে নতুন আদালত ভবন নির্মাণ ও কর্মচারী নিয়োগ।
- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের কোন সদস্য দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাসিক চাঁদার ভিত্তিতে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা।
- দেশের বিভিন্ন জেলায় যুগ্ম জেলা জজ আদালত সৃষ্টি করে বিচারক নিয়োগ করা হলেও উক্ত আদালতসমূহের বিপরীতে কোন সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে অন্য আদালত থেকে ধার করা কর্মচারী দিয়ে ঐসব আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা মামলাজটের অন্যতম কারণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ভাতাদি) আদেশ ২০১৬ এর ১৩ অনুচ্ছেদের কারণে পদোন্নতিপ্রাপ্ত যুগ্ম-জেলা জজগণকে সিনিয়র সহকারী জজ পদের বেতন নিতে হচ্ছে। তাছাড়া, বিশেষ ভাতার শতকরা হারও এমনভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে বেতন বৃদ্ধি পেলেও ভাতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তাই, উক্ত আদেশের ১৩ অনুচ্ছেদ বাতিল ও ২২ অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক মূল বেতন অনুযায়ী বিচারিক ভাতা প্রাপ্তির বিধান প্রণয়ন করা।
- রূপকল্প ২০২১ এর বাস্তবায়নে অধস্তন আদালতসমূহে অনলাইন ডায়েরী, কজলিস্টসহ কেস ম্যানেজমেন্টের জন্য উন্নত সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও আদালত ব্যবস্থাপনায় আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ।
- দেশের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালসমূহ মামলারভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় ট্রাইব্যুনালের প্রতি ২০০০ মামলার বিপরীতে একজন বিচারক নিয়োগ প্রদান।
- অতিরিক্ত জেলা জজ পদ দ্বিগুণ করা
- প্রতি ৫ (পাঁচ) জন বিচারকের বিপরীতে একটি মাইক্রোবাস বরাদ্দ করা।
- যতদ্রুত সম্ভব ই-জুডিসিয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন।
- বিচার বিভাগ পৃথকীকরণকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলাসমূহে চলমান চীফ জুডিসিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ দ্রুত সমাপ্ত করে উক্ত ভবনসমূহে বিচারকাজ শুরু করা।

- প্রেষণে কর্মরত বিচারকগণের ছয় মাসের বিচারিক অভিজ্ঞতা থাকলে পদোন্নতি প্রদান; যাতে পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণে অযথা দীর্ঘসূত্রিতা তৈরী না হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন।
- বিচারকদের পদোন্নতিতে জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখা।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ভাতাদি) আদেশ ২০১৬ এর ১৩ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনয়ন; যাতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত বিচারকগণকে পূর্বের স্কেলে বেতন পেতে না হয়।
- জেলা জজদের ডমেস্টিক এইড এলাউন্স পুনঃপ্রবর্তন।
- অতিরিক্ত জেলা জজগণ মৃত্যুদন্ড আরোপযোগ্য অপরাধের বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকেন, অথচ প্রায়শই তাদেরকে অফিস থেকে গণপরিবহনযোগে বাসায় ফিরতে হয়। তাই একই পদ মর্যাদার অধিকারী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরূপ তাদের জন্যও সার্বক্ষণিক গাড়ীর ব্যবস্থা করা।
- প্রাধিকার প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রীম এবং গাড়ী সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী সরকারের যুগ্ম-সচিব, ইকোনোমিক ক্যাডারের যুগ্ম-প্রধান এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং) পর্যায় হতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে সুদমুক্ত ২৫ লক্ষ টাকা বিশেষ অগ্রীম এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগের একই পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ সুবিধা হতে বঞ্চিত বিধায় এরূপ বৈষম্যের প্রতিকারে উক্ত নীতিমালায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভূক্ত করা।
- অপরাপর সার্ভিসের অনুরূপ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য ঢাকায় রেস্ট হাউজ স্থাপন; যাতে দাপ্তরিক প্রয়োজনে ঢাকায় অবস্থানকালে বিচারকগণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।
- উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট নিয়োগের কমপক্ষে পঞ্চাশ ভাগ অধস্তন আদালত হতে নিয়োগ প্রদান।
- বিচার বিভাগের সদস্যদের জন্য সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রীম এবং গাড়ী সেবা নগদায়ন নীতিমালার অনুরূপ নীতিমালা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরও জনকল্যাণমুখী ও বিচার বিভাগের বিরাজমান মামলাজট হ্রাসে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অধিকতর কার্যকররূপে বাস্তবায়ন করা।
- প্রতি স্তরে দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ আপীল ফোরাম নতুনরূপে স্থির করা প্রয়োজন, যাতে অহেতুকভাবে তুচ্ছ মামলা আপীল বিভাগ পর্যন্ত না পৌছায়।
- বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনকে কার্যকর ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে প্রতি জেলায় আইসিটি বিশেষজ্ঞ পদ সৃজনপূর্বক উক্ত পদে দক্ষ লোক নিয়োগ।
- প্রেষণে কর্মরত বিচারকগণের পদোন্নতি যাতে কেবল বিচারকার্যের অভিজ্ঞতাজনিত কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়।
- প্রেষণে কর্মরত বিচারকগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিধিতে বর্ণিত অভিজ্ঞতা শিথিল করা প্রয়োজন।
- সারা দেশে ইলেকট্রনিক সাক্ষ্য গ্রহণ চালু করা।
- মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পূর্ণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির দিক নির্দেশনামূলক অভিভাষণ

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের বক্তব্য শেষে মাননীয় প্রধান বিচারপতি জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন' ২০১৬-এ অংশগ্রহণকারী সকল বিচারকগণের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসা বিচার বিভাগে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এবং সমস্যাসমূহের কার্যকর সমাধানে গ্রহণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন ও অনুপ্রেরণাদায়ক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই বিচার বিভাগের প্রতি যাতে দেশের আপামর জনসাধারণের আস্থা সমুন্নত থাকে সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকার আহবান জানান। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজন প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের সকল উন্নত রাষ্ট্রে এ ধরনের সম্মেলন আয়োজিত হয়ে থাকে। এমনকি ভারতে রাজ্য পর্যায়েও বিচার বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়ে থাকে এবং উক্ত অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ, এমনকি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পাকিস্তান আমলের পূর্ব পর্যন্ত এদেশেও এ ধরনের সম্মেলন আয়োজিত হত, যা পরবর্তীতে সংগঠনভিত্তিক সম্মেলনে পরিণত হয়। তাই তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ববর্তী সম্মেলনে ২০১৬ সালকে 'মামলা নিষ্পত্তির' বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, এবার ২০১৭ সাল হবে 'আদালতে মানুষের অধিকার রক্ষার বছর' এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল বিচারককে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে এবং এই স্বাধীনতা সমুন্নত রেখে এমনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতে হবে যাতে মামলার কোন এক পক্ষ মামলায় হারা সত্ত্বেও যেন বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা না হারায়।

তিনি আরও বলেন, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অয়োজিত সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রধান বিচারপতিগণ এসেছিলেন, যারা বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বিচারকদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কেননা তাদের আদেশ টাকা কিংবা অন্যান্য সরকারি সুবিধাদির চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকল বিচারক তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হলে অচিরেই বিদ্যমান মামলাজট নিরসন সম্ভবপর হবে।

তিনি বলেন, বিচারকগণ স্বতন্ত্র। তাদের দাবী-দাওয়াও আলাদা এবং তা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া উচিত। তিনি যে কোন প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রি অফিসের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বিচারকগণকে কর্মস্থলে দাওয়াত কিংবা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকার আহবান জানান। এছাড়া তিনি জেলা পর্যায়ে নিয়মিতভাবে জুডিসিয়াল কনফারেন্স আয়োজন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উক্ত কনফারেন্সে পুলিশ ও সরকারি কৌসুঁলীদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদানের আহবান জানান।

তিনি বিচারকগণকে সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সমন জারীতে অহেতুক বিলম্ব রোধে সতর্ক থাকতে বলেন। এছাড়া তিনি আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলসের যথাযথ অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কর্মচারী নিয়োগে স্থানীয়দের প্রধান্য দেয়ার আহবান জানান।

তিনি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণকে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে অধিকতর সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতে বলেন এবং বিচারকগণের পোশাক-পরিচ্ছদ যাতে বিচারকদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

আদালত ব্যবস্থাপনা আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে তিনি প্রতিটি আদালতের কর্মচারীগণের জন্য পরিচয় পত্র চালু করার আহবান জানান এবং কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা, সেবাপরায়ণতা ও সততার নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি অধস্তন আদালতের নকলখানার কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিচারকগণকে অধিকতর মনোযোগী হবার আহবান জানান এবং ডিক্রী প্রস্তুতকরণে অহেতুক বিলম্ব না করার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি বিচারকগণকে মামলা শুনানীর দীর্ঘদিন পর রায় না লেখা কিংবা রায় প্রদানে বিলম্ব না করার ব্যাপারে সচেতন হতে বলেন। মামলার সাক্ষী ফেরত না দেয়া কিংবা অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদানে বিলম্ব না করার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে একমত পোষণ করে তিনি বলেন দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন সহ পুরোনো আইনসমূহকে যুগোপযোগী করতে হবে।

তিনি বিচারকগণকে জ্ঞাত করেন যে, ২০১৭ সাল হতে বাংলাদেশের বিচারকগণকে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক অচিরেই স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে এবং এর আওতায় বাংলাদেশের ১৫০০ বিচারককে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তিনি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণকে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান।

তিনি হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলায় মিথ্যা মামলাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে বিচারকগণকে এগিয়ে আসতে আহবান জানান, যা মামলাজট নিরসনে সহায়ক হবে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি অংশগ্রহণকারী বিচারকগণকে এ মর্মে আশ্বস্ত করেন যে-

- **বিচারকগণের মর্যাদা সংক্রান্ত মামলার রায়ের আলোকে তাদের প্রাপ্য সুবিধাদির ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**
- **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ভাতাদি) আদেশ ২০১৬ এর ১৩ অনুচ্ছেদ তথা পদোন্নতির পরও বিচারকগণের নিম্ন স্কেলে বেতন পাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।**
- **অতিরিক্ত জেলা জজদের গাড়ীর বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।**
- **প্রতি জেলায় একজন করে আইটি বিশেষজ্ঞের পদ সৃজন ও উক্ত পদে নিয়োগ এর ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**
- **যে সকল জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন সমাপ্ত হয়নি, তা দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**

সম্মেলনের প্রথম দিনের সমাপনী অধিবেশনে ভাষণরত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি

মাননীয় প্রধান বিচারপতি সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন

মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য তৈরী “পারসোনাল ডাটা সীট” সফটওয়্যার শুভ উদ্বোধন করেন

আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা “ই-এপ্লিকেশন” সফটওয়্যার শুভ উদ্বোধন করেন

সম্মেলনে উপস্থিত হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দসহ অতিথিদের একাংশ

সম্মেলনে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

দর্শক সারিতে উপবিষ্ট নারী বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের একাংশ

গ্যালারিতে উপবিষ্ট বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের একাংশ

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন

উদ্বোধনী অধিবেশন

অধিবেশনের প্রধান অতিথি : **মাননীয় বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা**
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি

অধিবেশনের সভাপতি : **মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মিঞা**
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি

বিশেষ অতিথি : **মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী**
আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

সম্মেলনের ২য় দিনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল **জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম**। তিনি অধিবেশনের অতিথি এবং অংশগ্রহণকারী বিচারকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর একটি দেশের সফলতা নির্ভর করে। বিচার বিভাগের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিচারকগণ তাদের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন। বিচার প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণসহ এর সমাধানে সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে এবার জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন দুই দিন ব্যাপী করা হয়েছে। এর জন্যে বিষয়ভিত্তিক পাঁচটি কর্মঅধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজনে সহায়তা প্রদান করায় তিনি সহযোগী দাতা সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রমের সফলতা কামনা করে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিচার বিভাগের উপর বিপুল সংখ্যক মামলার চাপ আছে। এই মামলা নিষ্পত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিচারকগণকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তিনি মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে তাঁর নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সম্মেলনের সফলতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা তাঁর বক্তব্যে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য বিচারকগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিচারকদের মধ্যে তিনি দায়িত্বপালনের যে প্রবল আগ্রহ এবং প্রাণচাঞ্চল্য দেখেছেন, তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিনা বিলম্বে, স্বল্পব্যয়ে ও প্রকাশ্য বিচারের মাধ্যমে আইনসম্মত সুবিচার প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। বিচারকগণ নাগরিকগণের মানসম্মত সুবিচার নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিচারকের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিচারকদের মর্যাদার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

তিনি বলেন, সরকারের উদ্যোগে নুতন আদালত ভবন নির্মাণ, জনবল নিয়োগ, যানবাহন, আসবাবপত্র ও আইটি সরঞ্জাম সরবরাহ, নুতন বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও বিচারকগণের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে অধস্তন বিচার বিভাগে একটি উন্নতর কর্মপরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

বিচারকদের যথাসময়ে পদোন্নতির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, উপযুক্ত বিচারকদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদান সম্পন্ন করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট সর্বদা সচেষ্ট আছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হলো জনগণের আস্থা। সাধারণ মানুষের এই আস্থা অর্জনের জন্য বিচারকদের একদিকে যেমন উঁচু নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তেমনি অন্যদিকে সদা বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল আইন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি জেলার জ্যেষ্ঠ বিচারক হিসেবে জেলা জজকে তার অধীনস্ত বিচারক ও আদালত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও জেলার বিচার ব্যবস্থায় সামগ্রিক মানোন্নয়নে কাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি

জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে পরস্পরের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আদালতের ভবন ও জমির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, সহযোগী বিচারকদের সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করা, আদালতের অফিসসমূহ বিশেষত নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা ও জুডিসিয়াল মালখানা নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, বিচারপ্রার্থী জনগণের বিশেষত নারী ও শিশুদের আদালতে অবস্থান যেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য জেলা জজদের নির্দেশ দেন।

তিনি মামলা জটকে দূরারোগ্য ব্যাধির সাথে তুলনা করে বলেন, বিচারকদেরকে অবশ্যই মামলা অপ্রয়োজনীয় মুলতুবির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং আদালতের পুরো সময়কে বিচার কাজে ব্যয় করতে হবে। দৈনিক কার্যতালিকায় এমনভাবে ও এরকম সংখ্যায় মামলা রাখতে হবে যেন পুরো বিচারিক সময়ে এজলাসে কার্যরত থাকা যায়। তিনি বিচারকবৃন্দকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকারি গাড়ী নিয়ে জেলার বাইরে ভ্রমণ না করার নির্দেশ দেন। জেলা জজ নিজে সঠিক সময়ে আদালতে আসবেন, পুরো বিচারিক সময় বিচার কাজে ব্যাপৃত থাকবেন এবং অন্য বিচারকদের একইভাবে নিয়মানুবর্তী ও সময়নিষ্ঠ হতে সহায়তা করবেন মর্মে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

আইনজীবীগণকে বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আইনজীবীদের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ও পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন। আইনজীবীদের যুক্তিসঙ্গত কোনো বৈধ দাবী দাওয়া থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে জেলা জজ ব্যবস্থা নিতে পারবেন, কিন্তু কোনোক্রমেই আইন ও বিধির বাইরে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেন না মর্মে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি নিয়মিত জুডিসিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠান করার নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি দ্বিতীয় দিনের কর্ম অধিবেশনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান, আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের করণীয়, আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতি প্রয়োগের অপরিহার্যতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিচারকগণ তাঁদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে অধিবেশনসমূহ প্রাণবন্ত এবং ফলপ্রসূ করবেন মর্মে আশা প্রকাশ করেন। সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনসমূহের আলোচনার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হবে, যা বিচারকগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রয়োগ করবেন বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

তিনি অংশগ্রহণকারী বিচারকগণকে দায়িত্বপালনে আরও যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, বিচারকগণ সময়ানুবর্তিতা, কর্মনিষ্ঠা, সততা, পেশাগত জ্ঞান ও মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী জনগণের আস্থা অর্জন করবেন। অন্যদিকে বিচারকদের সার্বিক কল্যাণে তিনি তাঁর সাধ্যমত কাজ করে যাবেন মর্মে উল্লেখ করেন। সবশেষে তিনি কর্মঅধিবেশনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

''আইনগত সহায়তা প্রদানে সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও পারস্পারিক সহযোগিতা'' শীর্ষক অধিবেশন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর লিগ্যাল এইড কমিটির মাননীয় সভাপতি **বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম** এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে এ পর্যায়ে সম্মেলনে সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থা কম্যুনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস (সিএলএস) যুক্তরাজ্যের দাতা সংস্থা ডিএফআইডি এর সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে কীভাবে আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। গরীব ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের আইনগত সহায়তা প্রদানে সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কীভাবে অবদান রাখা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন গাইবান্ধার বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ **বেগম রাশেদা সুলতানা** এবং চট্টগ্রামের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট **জনাব মুন্সী মশিয়ার রহমান**। বিচার প্রার্থীদের আইনগত সহায়তা প্রদানে তাঁরা সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিএলএস এর ডেপুটি টিম লিডার **বেগম ফাতেমা রশিদ হাসান**।

কর্ম-অধিবেশন-১

“আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়”

সভাপতি ও সঞ্চালক:

মাননীয় বিচারপতি জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আলোচকবৃন্দ:

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শওকত হোসেন
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি জনাব এ,এন,এম, বসির উল্লাহ
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন:

জনাব মোঃ আতাবুল্লাহ
জেলা ও দায়রা জজ, হবিগঞ্জ

বেগম জেসমিন আরা বেগম
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ এর ২য় দিনে “আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়” বিষয়ে ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকা হতে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট অডিটোরিয়ামে কর্ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সকল জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনের প্রারম্ভিক উপস্থাপনা ও সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার **জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন**। অধিবেশনে সভাপতি ও সঞ্চালক হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের **মাননীয় বিচারপতি জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী** দায়িত্ব পালন করেন। আলোচক হিসেবে **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শওকত হোসেন** ও **মাননীয় বিচারপতি জনাব এ, এন, এম, বসির উল্লাহ** বক্তব্য রাখেন। বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন **জনাব মোঃ আতাবুল্লাহ**, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, হবিগঞ্জ এবং **বেগম জেসমিন আরা বেগম**, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে **বেগম উম্মে কুলসুম**, উপ-সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, **জনাব হুমায়ন কবির**, যুগ্ম-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় সহ পটুয়াখালীর জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা মহানগর দায়রা জজ, ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ, কিশোরগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ এবং খুলনার জেলা ও দায়রা জজগণ বক্তব্য রাখেন।

জনাব মোঃ আতাবুল্লাহ, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, হবিগঞ্জ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধে নিম্নোক্ত বিষয় উঠে আসেঃ

- আদালত ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীই হচ্ছে আদালত প্রশাসন। আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এক দিকে যেমন বিচারকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক, অন্য দিকে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিও বাঞ্ছনীয়। আদালত প্রশাসন দক্ষতার সাথে যাতে কাজ করতে পারে সে জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রণীত দেওয়ানী নিয়মাবলী ও ফৌজদারি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য C.R.O. Vol-I ও II তে এবং Cr.R.O. Vol-I ও II তে প্রশাসনিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী এবং সংশ্লিষ্ট ফরম্স যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। আদালতের নেজারত, নকল, হিসাব, ফর্মস্ এন্ড স্টেশনারি, রেকর্ডরুম এবং লাইব্রেরী শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলী এবং এ সংক্রান্ত নিয়ম ও বিধি বিধান C.R.O. Vol-I ও II এবং Cr.R.O. Vol-I এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সে সব বিধিসমূহ সর্ম্পকে বিচারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের স্বচ্ছ জ্ঞান থাকতে হবে এবং সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

➢ আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দ্রুত শূন্য পদ পূরণ বাঞ্ছনীয়। শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত পদোন্নতি এবং নিয়োগের বিধি বিধান সর্ম্পকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং নিয়োগ কমিটির সদস্যদের সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ, যথাযথ ও হস্তক্ষেপ মুক্ত হতে হবে। অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ প্রাপ্ত হয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতায় পতিত হয়।

➢ অনেক আদালতে স্টেনোগ্রাফার/স্টেনো-টাইপিস্ট/কম্পিউটার অপারেটার নেই। আবার অনেক জজশীপে নাইট গার্ড, সুইপার ও মালি নেই। আদালতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নাইট গার্ড এর পদ সৃজন করা জরুরী। আদালত ভবনসহ আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির স্বার্থে মালি ও সুইপার এর পদ সৃজন করা আবশ্যক। যে সব আদালতে স্টেনোগ্রাফার/স্টেনো-টাইপিস্ট/কম্পিউটার অপারেটের, নাইট গার্ড, সুইপার ও মালি নেই সেই সব কোর্টে উক্ত পদসমূহ অতি দ্রুত সৃজন করে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

➢ সারাদেশে নুতন জজশীপ সৃজিত হয় ১৯৮৪ ইং সালে। তখনকার মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এবং প্রশাসনিক বিষয় বিবেচনায় রেখে আদালত সমূহে পদ সৃজিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা তখনকার তুলনায় ১০ গুণেরও বেশি। কিন্তু সে তুলনায় নুতন পদ সৃজিত হয়নি। এতে বিচার প্রশাসনের গতি বৃদ্ধিতে বাঁধার সৃষ্টি হয়। ফলে বিচার প্রশাসনের গতি বৃদ্ধিকল্পে মোকদ্দমার সংখ্যা বিবেচনায় নুতন পদ সৃজন করা যুগের দাবী। অনেক জেলাতেই জজশীপ এবং ম্যাজিস্ট্রেসীতে অফিস ও এজলাসের স্বল্পতা থাকায় আদালতের কার্যক্রম ভাগাভাগি করে সম্পন্ন করতে হয়। আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঐসব স্থানে অতিদ্রুত অফিস ও এজলাসের ব্যবস্থা করে এ সমস্যা দূর করতে হবে। বিদ্যমান কোর্ট বিল্ডিংকে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

➢ আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বিচার কার্য দক্ষতার সাথে সম্পন্নের জন্য বিভিন্ন বিচারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত হয়। কাজেই আদালত প্রশাসনের উপর কমপক্ষে ৭ দিনের জন্য Intensive Training এর ব্যবস্থা করা হলে আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। যে সকল দেশে বিচার প্রশাসনের সুনাম রয়েছে সে সব দেশে আমাদের দেশের বিচারক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে আমাদের দেশের বিচার প্রশাসনকেও তাঁরা সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবেন।

➢ বার্ষিক পরিদর্শন ও বিচারিক সম্মেলন সংক্রান্ত বিধানাবলী জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম অনুসরণ করে পরিদর্শন ও বিচারিক সম্মেলন করলে তারা সহ অন্যান্য বিচারকদের প্রশাসনিক দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। আদালত প্রশাসনের ক্রটি ও অনিয়ম এসব পরিদর্শনের মাধ্যমে সহজেই বের করা সম্ভব। ঐ সব ক্রটি ও অনিয়ম সম্পর্কে বার্ষিক বিচারক সম্মেলনে ও ত্রৈমাসিক সম্মেলনে আলোচনা ও মত বিনিময় করলে সে সব ক্রটি ও অনিয়ম দূরীভূত হবে এবং আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

➢ বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস সংক্রান্ত বিধি বিধান প্রয়োগে প্রত্যেক বিচারককে পারদর্শী হতে হবে। ছুটি, ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা, পেনশন, বদলী ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োগ করতে হবে। অফিস এবং অফিস রুটিন, করোস্পন্ডেস, অফিস ব্যবস্থাপনা, সুপারভিশন, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ বিষয়ে বিধানাবলী সর্ম্পকে প্রত্যেক বিচারকের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রত্যেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ, মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি বিভাগ ও অফিসের কার্যাবলী সঠিক ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ঐ সকল কার্যাদি দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পন্ন করছে কি না তা সংশ্লিষ্ট জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ, মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম-কে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ক্রটি ও অনিয়ম পাওয়া গেলে তা সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ক্রটি অনিয়ম পরিলক্ষিত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে।

➢ প্রসেস জারীর বিষয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক জজশীপ এবং ম্যাজিস্ট্রেসীর প্রধানসহ জাজ-ইন চার্জ নেজারতকে প্রসেস জারী সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। নাজির তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না তা দেখভাল করতে হবে। কোথাও অনিয়ম পাওয়া গেলে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনক না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

➢ নকল এবং নকল শাখা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধানাবলী অনুসরণ করে নকল সরবরাহ করা হচ্ছে কি না এবং জাজ ইনচার্জ, নকল শাখা এই বিষয়ে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কি না তা জেলা ও দায়রা জজ এবং ক্ষেত্র মতে মহানগর দায়রা জজ, মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম-কে মাঝে মধ্যে মনিটরিং করতে হবে। নকল শাখায় কর্মরত প্রধান পরীক্ষক, কপিস্ট এবং টাইপিস্ট তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছেন কি না তা নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। রেকর্ড রুমের ব্যবস্থাপনা, রেকর্ডের হেফাজত, স্থানান্তর, পরিদর্শন এবং ধ্বংস সংক্রান্ত বিধানবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে এবং ঐসব বিধানাবলী বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

➢ একাউন্ট রেজিস্টার, প্রাইমারী রেজিস্টার, সাবসিডিয়ারী রেজিস্টার, স্টাটিসটিক্যাল রেজিস্টার সম্পর্কিত বিধি বিধান আছে। ঐ সব রেজিস্টার সর্ম্পকে বিচারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং ঐ সব রেজিস্টার যাতে বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করা হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্টেটমেন্টস সংক্রান্ত ফর্মস্, কেসের শ্রেণী বিন্যাস, স্টেইটমেন্টস সংক্রান্ত বিবৃতি ও বিবরণী সংকলন, সাময়িক বিবরণী ও উহাতে তারিখ পেশ সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিচারক ও কর্মচারীদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এবং তার বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

➢ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম এর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বাস্তব ভিত্তিক হতে হবে।

➢ পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত বিধানাবলী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে। পণ্য ক্রয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিচারকদের সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে বিচারকের জন্য বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে।

➢ প্রায়ই বিদ্যুৎ না থাকার কারণে প্রশাসনিক কাজ বাঁধাগ্রস্থ হয়। প্রত্যেক আদালতে ডবল ফেস বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ কম বাঁধাগ্রস্থ হবে। এছাড়া জেনারেটর স্থাপনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আদালত প্রশাসনের কাজ যাতে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা যায় তজ্জন্য আদালত ও আদালত প্রাঙ্গনে C.C ক্যামেরা স্থাপন করা আবশ্যক।

➢ আদালত প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং আধুনিক আদালত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য Digitization এর বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে একটি National Judicial data base system এবং জেলা ওয়ারী data base system আবশ্যক। ইহাতে আদালতের কজ লিস্ট, রায় সহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য থাকবে এবং বিচার প্রার্থী জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই সেখান থেকে তথ্য আহরণ করতে পারবেন। নির্দিষ্ট বিচার বিভাগীয় Website চালু করা হলে বিচার প্রার্থীগণ আদালতে তাদের আর্জি, জবাব, দরখাস্ত, অভিযোগ ইত্যাদি পেশ করতে সক্ষম হবেন। এজন্য বিদ্যমান আইনে সংশোধন আনা আবশ্যক। সেই সাথে Free & fast Wi-Fi নিশ্চিত করতে হবে। প্রাসঙ্গিক সকল কেইস'ল একটি নির্দিষ্ট Website এ আনতে হবে। ইতোমধ্যে সিলেট জজশীপে Digitization এর ফলে আদালত প্রশাসনে গতি এসেছে এবং বহুলাংশে বিচার প্রার্থী জনগণ, সাক্ষীগণ ও আদালত উহার সুফল ভোগ করছে। প্রায়ই জেলা জজশীপ, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সমগ্রী ত্রুটির জন্য ব্যবহার অনুপযোগী হয়। সে সব ত্রুটি দূর করার জন্য এবং আদালতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ট্রেনিং ও এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত সব কোর্টে একজন I.T. বিশেষজ্ঞের পদ সৃজনসহ নিয়োগ এর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রত্যেক আদালতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

জনাব জেসমিন আরা বেগম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা কর্তৃক উপস্থাপিত "প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়" শীর্ষক প্রবন্ধঃ

Efficient court administration is main factor for giving the litigants speedy remedy with minimum costs. In order to ensure efficient court administration the judges must have the leadership role in properly managing the affairs of their respective courts. The success of the administration of justice in its wider connotation depends on the efficient court administration and management of the courts business. Before a case goes on for trial it has to be made ready on

completion of various pretrial stages which are done by the court support staff under the supervision of the presiding judge of the court. Registration of suits and cases, service of summons are usually done by the staff of the Sherestha and Nazarat. Other incidental matters are also dealt with by them. Thus the working of a court is a chain of process from the beginning to the delivery of verdict in which the judges and members of court support staff play their respective roles. If the entire chain works well, the entire adjudicatory process goes well giving the desired result meaning thereby the efficient administration of justice.

Courts must provide quality judicial services more efficiently. To provide efficient quality judicial service the judicial officers especially, the District Judge and Chief Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate may formulate some principles to be followed within his/or her Judgeship or Magistracy. In this respect, if we look into our day to day works of Courts then we can devide our official functions, specially our court administration into three wider heads, such as:

1. Work related Governance
2. Work related Decision making and case administration
3. Work related Getting fund for the courts and managing the funds

1. Principles relating to the work of Governance:

Governance is the means by which an activity is directed to produce the desired outcomes. Good governance is necessary to accomplish the core purposes of courts; delivering timely, effective, fair and impartial justice.

The governance structure should be apparent and explicit with clearly defined relationships among governing entities, presiding judges, and other agencies working in the dispensation of justice system.

Both the litigants and the lawyers working in the system need to understand how the governance structure operates, who has authority to make decisions, how decisions are made, and how all component parts relate.

A well-defined governance structure should enable development of court wide policies that ensure uniformity of decisions and uniformity of treatment of similarly situated litigants throughout the court.

The governance structure should enable reasonably uniform administrative practices for the entire court system that provide the greatest access and quality at the least cost.

The District and Sessions Judges and the Chief Judicial Magistrates or Chief Metropolitan Magistrates must have a clearly articulated mission, and goals. If he or she can able to establish a well-defined governance, structure within his or her judgeship or magistracy only then he/she will be able to give a unified messages to the public as well as to the legislative and executive branches of the Government.

The authority should ensure that the court system has a highly qualified, competent and well-trained workforce.

To earn the public's trust and confidence and to provide quality judicial services, courts need judges with the highest ethical standards, extensive legal knowledge, who have complex and unique skills in leadership, decision making, and court administration. Courts similarly need

highly professional, ethical and competent staff. The authority should work to enhance the performance of the judicial system as a whole by continuously improving the personal and professional competence of all persons performing judicial functions by giving proper training.

The training programs should provide judicial officers and the court staff the knowledge and skills that are required to perform their responsibilities fairly, correctly and efficiently.

2. Principles relating to decision making and case administration:

Presiding officers should have control over a case. Effective administration of the court's entire case load demands that judges with the assistance of the court support staff manage and control the flow of cases through the court. A good judicial officer must be a good administrator in dealing his or her cases. He or she must establish a set of meaningfull events, adopt a realistic schedule; exercise firm control over the granting of time, use data to monitor the cases. Court procedure should be simple, clear, uniform to facilitate expeditious processing of cases with lowest of possible costs. Decisions of the court should demonstrate procedural fairness.

Courts must use available resources wisely to address multiple and conflicting demands. To do so they must continuously monitor performance and be able to know exactly how productive they are, how well they are serving public needs and what parts of the system and services need attention and improvement. Courts must continually evaluate the effectiveness of their policies, practices and new initiatives. This requires the collection and use of relevant, timely and accurate information that must then be used to make decisions on how to best manage court operations to ensure the desired outcomes.

3. Principles relating to getting fund for the courts and managing the funds:

The court system should be funded enough to provide technologies needed for the courts to operate efficiently and effectively and to provide the public services comparable to those provided by the other branches of government and private business.

Responsible funding entities should ensure that courts have facilities that are safe, secure and accessible and which are designed, built and maintained to improve the courthouse facilities.

District Judges or Chief Judicial Magistrates should make budget requests, basing solely upon demonstrated need supported by appropriate business justification.

আলোচনা পর্ব

আলোচনা পর্বের শুরুতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **উপ-সচিব, বেগম উম্মে কুলসুম** উল্লেখ করেন, "আদালতের সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা আধুনিকীকরণ করতে হবে। জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্যানেল/ফিটলিস্ট তৈরি করতে হবে। উচ্চ আদালতের আদেশে স্থগিত মোকদ্দমার মনিটরিং করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা আদালত ডিজিটালাইজড করার বিষয়ে শীঘ্র একনেকে প্রজেক্ট উপস্থাপন করা হবে যার ব্যয়ভার GoB থেকে পরিচালিত করা হবে। আদালতে সিস্টেম এনালিস্ট ও ডাটা এনালিস্ট পদ সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। Statement-এ যে মোকদ্দমা উল্লেখ করা হয় বাস্তবে তার সংখ্যা অনেক কম। ফলে Statement-এ উল্লিখিত মোকদ্দমার সংখ্যা বাস্তবে গণনা করে তার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। আদালত প্রশাসন সংক্রান্ত কয়েকটি নীতিমালা সংশোধনের কাজ চলছে এবং বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে। নকল প্রাপ্তি ও নকল ফি প্রদান বিষয়টি সহজ করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় ও সুপ্রীম কোর্টে কোন আবেদন দেওয়া ও জানার বিষয়ও সহজিকরণ করা আবশ্যক।"

মাননীয় বিচারপতি মোঃ শওকত হোসেন তার বক্তৃতায় বলেন, বিচারককে অবশ্যই নেতৃত্বের গুণাবলী মেইনটেইন ও প্রেজেন্ট করতে হবে। প্রত্যেক কলিগ এবং বারের সাথে সু-সম্পর্ক রাখতে হবে, মামলা রুজুর চেয়ে নিষ্পত্তির পরিমাণ বেশি হতে হবে, এজলাস টাইম বাড়িয়ে দিতে হবে, সিভিল আপিল বেলা আড়াইটায় শুনতে হবে, বেইলবন্ড বিষয়ে মনিটর করতে হবে, ক্রিমিনাল আপিল মোকদ্দমায় বেইল না দিয়ে এক মাসের মধ্যে রায় দিয়ে দিতে হবে এবং বিচারকদের সততা ও সময় নিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে।

মাননীয় বিচারপতি এ.এন.এম বসির উল্লাহ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রতি বছরই মামলার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে যোগদানের পরপরই পুরাতন মামলার তালিকা তৈরি করে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাইন্ড এ্যাপলাই করলে প্রশাসন দক্ষ হয়ে উঠবে এবং প্রত্যেক জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রটকে তাদের স্ব স্ব স্টেশনে কিছু কার্ডিনাল রুলস ফ্রেম করতে হবে। প্রত্যেক বিচারককে সময় মত আদালতে আসতে হবে ও প্রস্থান করতে হবে, সময় মত এজলাসে উঠতে হবে, ওর্ডার শিটে অফিসারের নাম উল্লেখ করতে হবে, রায়ের তারিখ শিফ্‌ট করা উচিৎ না, প্রকাশ্য আদালতে রায় দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, একজন আইনজীবীকে অন্য একজন আইনজীবী থেকে অপমান করার বিষয়ে সুরক্ষা করতে হবে, কর্মচারীদের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রসেস ইস্যু করতে হবে, স্যুট রেজিস্টারে মামলা এন্ট্রি আছে কিনা দেখতে হবে, উচ্চ আদালতে একই পিটিশন পেন্ডিং আছে কিনা যাচাই করতে হবে, উচ্চ আদালতে সময়মত নথি প্রেরণ করতে হবে এবং প্রত্যেক আদেশে কারণ থাকতে হবে। আদালত প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দিক নির্দেশনা ও দক্ষতার উপর। তাই তাদেরকে দক্ষ হতে হবে।

পটুয়াখালীর বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ **জনাব আবুল কাশেম মোঃ মোস্তফা** আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, জেলা জজকে অবশ্যই নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে, আইনের কোন ঘাটতি নেই, দুষ্ট স্টাফদের দ্রুত বদলীর ব্যবস্থা করতে হবে, পটুয়াখালীতে সহকারী জজ সংখ্যা মাত্র ২ (দুই) জন এর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

কিশোরগঞ্জের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ **জনাব মাহবুব উল ইসলাম** উল্লেখ করেন, কর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলীর ব্যবস্থা করতে হবে, দক্ষ কর্মচারীদের নিয়োগ দিতে হবে, নিয়োগ সঠিক হয়েছে কিনা তা হাইকোর্ট বিভাগের মাধ্যমে মনিটর করতে হবে।

খুলনার বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ **বেগম জেসমিন আনোয়ার** উল্লেখ করেন, খুলনা চৌকি জজ আদালতের লজিস্টিক সাপোর্ট হতাশা জনক, আসামীদের রাখার মত হাজতখানা নেই বলে আসামীদের থানা হেফাজতে রাখতে হয়, LCR তলব করলে চৌকি আদালত থেকে ঝুঁকি নিয়ে মটর বাইকে সদর আদালতে নথি আনা নেওয়া করা হয় যা নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ।

ঢাকার বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ **জনাব মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা** বলেন, তাদের নিজস্ব কোন রেকর্ড রুম নেই, নকল খানায় স্টাফ অনেক কম। ফলে নকল যথাসময়ে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না, সকল অফিসারদের মাসিক বিবরণী নিয়ে মাসে অন্তত একবার বসলে নিষ্পত্তির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

ঢাকার বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ **জনাব এস.এম. কুদ্দুস জামান** বলেন, বিচারকদের ম্যানেজারিয়াল দক্ষতার অভাব রয়েছে যা যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ও সচেতনতামূলক নির্দেশনার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি বিচারকদের সক্রিয় ভূমিকা ও বিচারিক মনোভাবের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। ঢাকা জেলা জজ আদালতে যাবতীয় ক্রয় ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সচ্ছতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে নিরূপন করে সম্পন্ন করার জন্য বিচারকদের দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। এসব কাজ করতে গিয়ে তারা বিচারিক কাজে মনোযোগ দিতে পারেন না। তিনি আদালতে নিয়োগ, ক্রয় ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা কমিটি গঠন করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার আহবান জানান।

অতঃপর অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি ও সঞ্চালক **মাননীয় বিচারপতি জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী** আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্ম-অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেন ঃ

অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ

- আদালতের জন্য বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীর নতুন পদ সৃজন করতে হবে।
- বিদ্যমান শূন্য পদসমূহ যথাসময়ে পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, যথাযথ ও হস্তক্ষেপমুক্ত হতে হবে।
- কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মনিটর করা যেতে পারে।
- বার্ষিক পরিদর্শন ও বিচারিক সম্মেলন সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা হলে পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে।
- নেজারত শাখা, নকল শাখা, হিসাব শাখা, ফরমস ও স্টেশনারি শাখা, রেকর্ড রুম, সার্বক্ষণিক তদারকি করতে হবে।
- আদালতের ডায়েরী, কজ লিস্ট ও রেজিস্টারসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আদালতসমূহে পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও আইটি সরঞ্জাম সরবরাহসহ প্রতিটি জজশীপে/ম্যাজিস্ট্রেসিতে একজন করে আইটি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।
- আদালত প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- আদালতের বিচারক ও কর্মচারীদের আদালত প্রশাসন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রত্যেক জেলা জজ/সিজেএম তাঁর অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম/অনুশাসন প্রণয়ন করতে পারেন।
- জেলা জজ/সিজেএম আদালতের সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা আধুনিকীকরণ করতে হবে।
- জেলা জজ/সিজেএম/সিএমএম পদায়নের ক্ষেত্রে ফিট লিস্ট প্যানেল প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- বছর ভিত্তিক মামলার সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী মামলার নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- অফিস সময় এবং এজলাস সময় যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- জামিননামা, সমন, এলসিআর ও উচ্চ আদালতের রিকুইজিশন সময়মত নিষ্পত্তি করতে হবে।
- আদালতের বিচার সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ ব্যতীত অন্যান্য কাজ যেমন-নিয়োগ, পদোন্নতি, ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করা যেতে পারে।
- কর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলীর বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।
- যেসকল চৌকি আদালতে হাজতখানা নাই সেখানে হাজতখানার ব্যবস্থা করতে হবে।
- চৌকি আদালত হতে জেলা জজ আদালতে রেকর্ড আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

কর্ম-অধিবেশন-২

''নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান''

সভাপতি ও সঞ্চালক:

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী

আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আলোচকবৃন্দ:

মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম

হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার

হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন:

জনাব আজিজ আহমেদ ভূঞা

বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, কুমিল্লা

শ্রীমতি জয়শ্রী সমদ্দার

বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৬ এর ২য় দিনের (২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ) কর্ম-অধিবেশনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত করণার্থে একটি সেশন সুপ্রীম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর বিচারকবৃন্দ (জেলা জজ), উক্ত ট্রাইব্যুনালসমূহে কর্মরত বিশেষ সরকারী কৌসুলী (বিশেষ পিপি), শিশু আদালত, ঢাকা এর বিচারক (অতিরিক্ত জেলা জজ), ডিআইজি প্রসিকিউশন এবং সিভিল সার্জন, ঢাকা এর প্রতিনিধি (ডাক্তার) অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনটি সঞ্চালনা ও সভাপতিত্ব করেন **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী**। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম** এবং **মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার**। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, কুমিল্লা এর বিচারক (জেলা জজ) **জনাব আজিজ আহমেদ ভূঞা** এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর বিচারক (জেলা জজ) **শ্রীমতি জয়শ্রী সমদ্দার** প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারীগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালীন উদ্ভূত সমস্যাবলী উপস্থাপন এবং তৎসংক্রান্তে তাদের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা উপস্থাপনের মাধ্যমে অধিবেশনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞ আলোচকদ্বয়ের এ বিষয়ে আলোকপাত এবং সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। অধিবেশনটির সমন্বয় ও প্রারম্ভিক উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব অরুণাভ চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

জনাব আজিজ আহমেদ ভূঞা, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, কুমিল্লা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ:

যৌতুকের দাবীতে সহিংসতার মামলা-সহিংসতা অনুপস্থিত তবে অন্য জটিলতা বিদ্যমান:

সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সমূহের বিচারাধীন মামলার মোট সংখ্যার ৮০% মামলা যৌতুক সংক্রান্ত। এর মধ্যে কেবল মাত্র যৌতুকের দাবীতে মারপিট করে সাধারণ জখম করা থেকে শুরু করে মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত

অভিযোগে আনীত মামলার সংখ্যা ৫% এর কম। তাহলে প্রশ্ন আসে বাকী মামলাগুলো কি মিথ্যা? আসলে এই মামলা সমূহের ক্ষেত্রে যৌতুকের জন্য মারপিট করার উপাদান অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের অমিল বা স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সাথে স্ত্রীর মতামতের পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবন অশান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে স্ত্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে এবং এই সংক্রান্ত অন্য কোন ফোরাম না পেয়ে বাধ্য হয়ে দ্রুত প্রতিকার লাভের আশায় স্বামীকে এবং তার নিকট আত্মীয়দের আসামী করে এই আইনের ১১(গ) ধারার বিধান অনুযায়ী মামলা দায়ের করে থাকেন। খোলা চোখে দেখলে যৌতুকের জন্য মারপিটের উপাদান নেই মর্মে প্রতীয়মান হলেও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধকে এই সব মামলায় প্রধান কারণ হিসেবে আবিষ্কার করা যায়। এমতাবস্থায় পক্ষগণের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত স্থানটি চিহ্নিত করতে পারলে এবং সেখানে মনোযোগ দিয়ে সম্ভব হলে আইনজীবীদেরও বাদ দিয়ে বিচারক তার চেম্বারে কেবল মাত্র স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে বসে কিছুটা সময় ব্যয় করে তাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক কথা বলে অনেকটা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করলে অতি দ্রুত এই সব মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

সুপারিশ: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৩৩ ধারায় সরকারকে একটি বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি তা প্রণীত হয়নি। উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আপোসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌতুকের জন্য বিচারাধীন মামলাসমূহের ক্ষেত্রে সমঝোতার দ্বারা কিভাবে সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করা যায় তার একটি গাইড লাইন উল্লেখ করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

ধর্ষণের চেষ্টা এবং যৌন পীড়নের মিথ্যা অভিযোগ সম্বলিত মামলা

এই আইনের ৯ (৪) (খ) অর্থাৎ ধর্ষণের চেষ্টার এবং ১০ ধারার যৌন পীড়ন ইত্যাদি অপরাধ সমূহের ক্ষেত্রে প্রায়শই মামলা আমলে নেওয়ার পর এবং আসামী গ্রেফতার কিংবা তার স্বেচ্ছায় হাজির হওয়ার পর জামিনের আবেদন সম্বলিত যে দরখাস্ত ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হয় তাতে দেখা যায়, বর্ণিত ধারা সমূহের অপরাধের উপাদান অনুপস্থিত। অথচ পক্ষদের মধ্যে টাকা পয়সার লেনদেন, জমি-জমা সংক্রান্ত জটিলতা অথবা সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে সে সব সমস্যাকে চিহ্নিত না করে দ্রুত নিষ্পত্তির আশায় কিংবা প্রতিপক্ষকে কারাগারে পাঠানো কিংবা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে এই সব মামলাসমূহ দায়ের করা হয়। এর ফলে মামলার আধিক্য দেখা দেয়।

সুপারিশ: গ্রাম আদালতকে কিংবা পৌর মেয়র ও সিটি কর্পোরেশনকে সংশ্লিষ্ট আইনের তফসিলে এই সব অপরাধ সমূহকে বিচারার্থে গ্রহণীয় করলে এই সব অপরাধের বিচার আপোসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সুযোগ দিলে একটা শুভ ফল বয়ে আনবে এবং আদালতে এই জাতীয় অপ্রয়োজনীয় মামলার সংখ্যাও কমে যাবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার সমাধান একান্ত সম্ভব না হলে তারা পক্ষদের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারবেন মর্মে বিধান করতে পারলে প্রকৃত অপরাধের বিচার ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে করা সম্ভব হবে।

একই পক্ষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক উদ্ভূত একাধিক মামলা

অনেক সময় যৌতুক আইন ১৯৮০ এর ৪ ধারার মামলা স্বামীর বিরুদ্ধে বিচারাধীন থাকাকালীন স্ত্রী আবার স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ১১(খ)/(গ) ধারার মামলা দায়ের করে থাকেন। এতে একই সময় একই বিষয়ে দুটি মামলা বিচারাধীন থাকায় মামলার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি আবার পারিবারিক আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে দেনমোহর ও ভরণপোষণের মামলা স্ত্রী দায়ের করে থাকেন। এতে একই পক্ষের মধ্যে একগুচ্ছ মামলা চলমান থাকায় প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে।

সুপারিশ: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল একটি সিনিয়র ট্রাইব্যুনাল এবং দায়রা ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত বিধায় আন্তরিক হলে এই ট্রাইব্যুনালেই অপরাপর আদালত সমূহে বিচারাধীন একই পক্ষগণের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক উদ্ভূত মামলাসমূহ সহ ট্রাইব্যুনালের মামলাটি একত্রে আপোসের সূত্রে নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

মামলাসমূহের আপোসযোগ্যতা এবং বিচারক ও প্রসিকিউটরদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ:

ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যার তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ার কারণে যথাসময় সাক্ষীর সমন কিংবা ওয়ারেন্ট ও গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা সম্ভবপর না হওয়ায় মামলাসমূহ দিনের পর দিন ঝুলে থাকে। আবার অনেক সময়

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়ার পরও যথাসময়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং পলাতক আসামীদের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ক্রোকী পরোয়ানা যথাসময়ে ইস্যু করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অনেক সময় আইনজীবীরা তাদের পেশাগত স্বার্থেও মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করতে চান না। ফলে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়।

সুপারিশঃ যেহেতু যৌতুকের জন্য মারপিটের অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর স্ত্রীর মধ্যকার মতের অমিল, বনিবনা না হওয়া কিংবা অন্য কোন লেনদেন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান থাকে সে ক্ষেত্রে ১১(গ) ধারার মামলাসমূহকে আপোসযোগ্য করে দিলে সারা দেশে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে এই ধরনের বিচারাধীন মামলা আপোসের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হলে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে। ট্রাইব্যুনালসমূহ এতে মামলা জট থেকে রক্ষা পাবে এবং বিবাদমান ঘরে শান্তি ফিরে আসবে। এই জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের সংশোধনও আবশ্যক।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে কর্তব্যরত সারা দেশের বিচারকগণকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Multi-Sectoral Programme on Violence Against Women এর আওতায় মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট এর সহযোগিতায় কর্মশালার ব্যবস্থা করে বিচারকগণ থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত নিয়ে এই আইনকে কিভাবে আরোও অধিক কার্যকর এবং বাস্তব সম্মত করা যায় সে জন্য সরকারী উদ্যোগ প্রয়োজন। এই কর্মশালায় মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট এন, জি, ওসহ মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহকেও সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে প্রসিকিউটর এবং বিচারকগণকে সংবেদনশীল করার ব্যবস্থা করতে পারলে সমাজে সচেতনতা বাড়বে এবং বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজ নিজ করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা পেয়ে আরও অধিক দায়িত্বশীল হবেন।

শ্রীমতি জয়শ্রী সমদ্দার, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা কর্তৃক উপস্থাপিত নিবন্ধে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

১। **সমস্যাঃ** মিথ্যা মামলা দায়েরের হার অনেক।

সুপারিশঃ মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য জরিমানা করার বিধান প্রবর্তন করা উচিত। তাহলে মিথ্যা মামলা দায়েরের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে।

২। **সমস্যাঃ** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য না হওয়ায় শুধু বিচার করার মাধ্যমে নিস্পত্তি করতে যাওয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়।

সুপারিশঃ এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য করা প্রয়োজন। তাতে মামলাজট বহুলাংশে কমে যাবে।

৩। **সমস্যাঃ** শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সারাদেশে বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালসমূহের মধ্যে কোন সাদৃশ্য (Uniformity) নাই। যার ফলে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার অনেকক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

সুপারিশঃ শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সারাদেশে বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য (Uniformity) আনয়নের জন্য গাইডলাইন প্রদান করা উচিত।

৪। **সমস্যাঃ** এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রদত্ত জামিন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন সংশ্লিষ্ট জেলার দায়রা আদালতে দায়ের হয়ে থাকে। দায়রা আদালতসমূহ প্রচুর সংখ্যক মামলার ভারে ভারাক্রান্ত থাকায় উক্ত রিভিশনসমূহ নিস্পত্তিতে দেরি হওয়ায় মামলায় দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়।

সুপারিশঃ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রদত্ত জামিন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিচারক কর্তৃক শ্রবণযোগ্য করার বিধান করা উচিত।

৫। **সমস্যাঃ** শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স সংক্রান্তে এই আইনের বিধান ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের সাথে সংঘাতপূর্ণ।

সুপারিশঃ শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স সংক্রান্তে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের সাথে বিদ্যমান সংঘাত দূরীকরণ অত্যাবশ্যক।

৬। **সমস্যাঃ** ছেলে শিশুদের যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে কোন প্রতিকার এই আইনের অধীন প্রবর্তিত হয় নাই যা অনাকাঙ্খিত।

সুপারিশঃ অবিলম্বে ছেলে শিশুদের যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে প্রতিকারের বিধান এই আইনে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

৭। **সমস্যাঃ** মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সাক্ষ্য প্রদান না করেই অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে চলে যান। ফলে মামলা নিস্পত্তি বিলম্বিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্যের অভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা সম্ভব হয় না।

সুপারিশঃ তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালসমূহ হতে বাধ্যতামূলক অনাপত্তিপত্র (Clearance Certificate) আনয়নের বিধান প্রণয়নে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

আলোচনা পর্ব

জনাব রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, গাইবান্ধা আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যাঃ** এই আইনের অধীন শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স শিশু আইন, মানবপাচার আইন এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন এর সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে শিশু সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের ক্ষেত্রে বিচারকার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে মামলা বিলম্বিত হচ্ছে।

সুপারিশঃ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধনপূর্বক বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ আবশ্যক।

২। **সমস্যাঃ** যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ থাকা সত্বেও এই আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে মামলার হার বেড়েছে এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তি হতে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

সুপারিশঃ যেকোন একটি আইন বিলুপ্ত করা অত্যাবশ্যক।

৩। **সমস্যাঃ** এই আইনে বলা আছে ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে ভিকটিম সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পরীক্ষিত হবেন এবং ডাক্তার তৎমর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিকটিমগণ হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য যান না এবং অনেক সময় ধর্ষণের শিকার হওয়ার ৫/৭ দিন পর পরীক্ষার জন্য যান। অথচ তখন পরীক্ষা করলে কোন লাভ হয় না। ফলে ন্যায়বিচার প্রদান করা যায় না।

সুপারিশঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং এন, জি, ও দের সহায়তায় এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে ভিকটিমের তাৎক্ষণিক ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্নকরণ এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহকরণ সংক্রান্তে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪। **সমস্যাঃ** এই আইনের ২৫ ধারায় বলা আছে যে, এই ট্রাইব্যুনাল একটি দায়রা আদালত হবে। অনেক সময় দেখা যায় যৌতুকের কারণে হত্যার অভিযোগে আনীত মামলায় হত্যা প্রমাণিত হয় কিন্তু যৌতুকের দাবী প্রমাণিত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল হত্যার কারণে পেনাল কোডের ৩০২ ধারার আওতায় শাস্তি প্রদান করতে পারবেন কি না সেই বিষয়ে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়। যা মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।

সুপারিশঃ এ বিষয়ে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

জনাব সেলিম মিয়া, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, চট্টগ্রাম উল্লেখ করেনঃ

১। **সমস্যাঃ** আপোসযোগ্য না হওয়ায় মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্বিত হচ্ছে।

সুপারিশঃ এই আইনের অধীন ৯(৪)(খ), ১০ এবং ১১(গ) ধারাসমূহের অধীন অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য করলে ট্রাইব্যুনালসমূহে বিদ্যমান মামলার সংখ্যা ৫০% কমে যাবে।

২। **সমস্যা:** এই আইনে শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স শিশু আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই আইনের অধীন শিশুদের সংশ্লিষ্ট মামলাসমুহ আমলে গ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

সুপারিশ: অবিলম্বে এইরূপ অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ আবশ্যক।

৩। **সমস্যা:** সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং সংশ্লিষ্ট বিচারকগণের কোন নিজস্ব ভবন ও বাসভবন নেই। যার ফলে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

সুপারিশ: এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

জনাব আমিনুল ইসলাম, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, নওগাঁ আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** জনগণ এই ট্রাইব্যুনালের কাছে বিচার নয় বরং সমাধান চাইতে আসেন। মামলা হয়তো মিথ্যা কিন্তু সমস্যাটা সত্য। আসামীর জেল চাইতে নয় বরং বিদ্যমান সমস্যা সমাধান চাইতে নালিশকারী আদালতে আসেন। তাই সেই সমাধান করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ না করে প্রণীত আইন এর বিধান দ্বারা বিচার করার চেষ্টা করায় ন্যায়বিচার যেমন প্রদান করা যাচ্ছে না তেমনি মামলার হারও বেড়ে যাচ্ছে।

সুপারিশ: নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে বিস্তৃত আকারে মনস্তাত্বিক গবেষণার ব্যবস্থা করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী এই সব সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি প্রবর্তন করা জরুরী। এই বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা পালন অত্যাবশক।

২। **সমস্যা:** এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বেশিরভাগ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এক বছরেও পাওয়া যায় না। ফলে মামলা বিলম্বিত হয়।

সুপারিশ: কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই শুধুমাত্র নালিশকারীর জবানবন্দীর প্রেক্ষিতে সরাসরি মামলা আমলে নেয়ার সুযোগ প্রদান করে বিধান প্রবর্তন করা উচিত। তাতে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে।

৩। **সমস্যা:** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য না হওয়ায় মামলা বিলম্বিত হচ্ছে।

সুপারিশ: এই আইনের অধীন অপরাধসমুহ আপোসযোগ্য করা উচিত। তাতে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে।

৪। **সমস্যা:** যেহেতু আদালতে এই আইনের অধীন মামলাসমূহ আপোসযোগ্য নয় তাই অনেক সময় স্থানীয়ভাবে পক্ষদের মধ্যে আপোস হওয়ায় পক্ষগণ আর আদালতে আসেন না। ফলে মামলাটি নিষ্পত্তি করা যায় না। অথচ মামলাটি দিনের পর দিন পড়ে থাকে। ফলে মামলাজট দেখা দেয়।

সুপারিশ: এই ধরনের মামলাগুলোর ক্ষেত্রে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এর ২৪৭ ধারার আদলে নালিশকারীর অনুপস্থিতিতে মামলা খারিজের বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। এর ফলে মামলাজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

জনাব খন্দকার হাসান মোঃ ফিরোজ, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, মুন্সিগঞ্জ আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

সমস্যা: অনেক মামলাতেই মনোমালিন্য বা অন্যকোন বিরোধের জের হিসেবে এই ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ আনয়ন করা হয় বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ এগুলো স্থানীয়ভাবেই মীমাংসাযোগ্য। এর ফলে মামলাজট বাড়ছে।

সুপারিশ: এই আইনের কিছু কিছু অপরাধের বিচার গ্রাম-আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হিসেবে বিধান প্রবর্তন করা উচিত।

জনাব মাহবুবুর রহমান, ডিআইজি (প্রসিকিউশন), ঢাকা আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** বেশিরভাগ সময়ই মামলার সাক্ষীগণ তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় জবানবন্দী প্রদানের সময় যে কথা বলেন ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভিন্ন সাক্ষ্য প্রদান করেন। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়।

সুপারিশ: ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধকৃত জবানবন্দীর সাক্ষ্যগত মূল্য শুধুমাত্র সমর্থিত সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সাক্ষ্যগত মূল্য পুনরায় বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নতুন করে নির্ধারণ করা উচিত।

২। **সমস্যা:** আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলার ক্ষেত্রে প্ররোচনা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সুইসাইডাল নোট যথেষ্ট বলে পরিলক্ষিত হয় না। যার ফলে এই ধরনের মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য।

সুপারিশ: এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে মামলা প্রমাণের সুস্পষ্ট ইনডিকেটরগুলো নির্দিষ্ট করে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান আবশ্যক।

৩। **সমস্যা:** মিথ্যা মামলার কারণে অনেক আসামী ৮/১০ বছর ধরে ট্রাইব্যুনালে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছেন। যা মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

সুপারিশ: মিথ্যা মামলার কারণে শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালসমূহের আরো উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। একই সংগে আইনটির অধীন সমস্ত অপরাধ আপোসযোগ্য করা উচিত।

জনাব আব্দুল মান্নান, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, বগুড়া আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** একই পক্ষের মধ্যে যৌতুক, বহুবিবাহ, ডির্ভোস, খোরপোষ, দেনমোহর প্রভৃতি নিয়ে ৪/৫ ধরনের মামলা বিভিন্ন আদালতে একই সময়ে চলমান থাকে আমাদের দেশে। যার ফলে মামলাজট বৃদ্ধি পায়।

সুপারিশ: জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মডেল অনুসরণ করে দাম্পত্য সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মামলাগুলো একটি মাত্র আদালতে এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য এই আদালতে জ্যেষ্ঠ জেলা জজগণকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। একই সংগে এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মীমাংসাযোগ্য করা উচিত।

২। **সমস্যা:** অনেক মামলায় (বিশেষত ধর্ষণ) দেখা যায় যে, ধর্ষণের শিকার নারী এবং ধর্ষণের ফলে জন্মানো সন্তান এর জীবনযাপনের কোন অবলম্বন থাকে না। সম্প্রতি রাজশাহীতে এমন একটি মামলা পাওয়া গেছে যেখানে একটি মেয়ে তাঁর পিতা কর্তৃক ধর্ষিত হন এবং এর ফলে তাঁর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই মামলার আসামী ভারতে পালিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হন। এর ফলে ভিকটিম মেয়েটিকে এবং তাঁর সন্তানকে সমাজে পুনর্বাসিত করার কোন উপায় পাওয়া যাচ্ছিল না।

সুপারিশ: এই ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে ভিকটিমদের সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য পুনর্বাসনমূলক আইনগত সহায়তা (Rehabilitative Legal Aid) প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

৩। **সমস্যা:** অনেক সময় ভিকটিমদের ডিএনএ টেস্ট করার ফি প্রদান করার আর্থিক সংগতি থাকে না। ফলে মামলায় এরূপ টেস্টের রিপোর্ট এর অভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা যায় না।

সুপারিশ: আর্থিক সংগতিহীন ভিকটিমদের ডিএনএ টেস্টের ফিস সরকারী কোষাগার থেকে প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার কালেকটরকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণকে প্রদান করে বিধান প্রবর্তন করা অতীব জরুরী।

৪। **সমস্যা:** মহিলা ডাক্তার না থাকায় ধর্ষণ মামলার ভিকটিমগণ মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে যেতে চান না। ফলে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এর অভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা যায় না।

সুপারিশ: ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে ভিকটিমদের মেডিক্যাল পরীক্ষা মহিলা ডাক্তার দ্বারা সম্পাদনের জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বিধান প্রবর্তন করা উচিত।

বেগম তানজিনা ইসমাইল, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫, ঢাকা আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** ডাক্তারগণ ভিকটিমদেরকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে চান না এবং ডাক্তার সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিতে আদালতে হাজির হন না। ফলে মামলা বিলম্বিত হয়।

সুপারিশ: এ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পরিপত্র জারির জন্য অনুরোধ করা প্রয়োজন।

২। **সমস্যা:** এই ধারার অধীন অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য করা হলে নারীরা আরো হয়রানির শিকার হবে।

সুপারিশ: অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য করা যাবে না।

জনাব ডা. অজয় কান্তি কর্মকার, সিভিল সার্জন, ঢাকা এর প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় নারী নার্সের সহায়তায় পুরুষ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করতে হচ্ছে।

সুপারিশ: প্রয়োজনে বিশেষ বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে নারী ডাক্তারগণকে ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তার হিসেবে নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ফরেনসিক টেস্টে নারী ডাক্তারগণের অপ্রতুলতা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২। **সমস্যা:** Simple Hurt, Greivious Hurt প্রভৃতি মেডিকো লিগ্যাল টার্মিনোলজির কারণে অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয় ফলে ডাক্তারদের সম্পর্কে সাধারণ জনগণের এবং আদালতের মনে বিরুপ ধারণা জন্ম নেয় যা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

সুপারিশ: মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এর সাথে ভিকটিমের জখমের ছবি সংযুক্তির বিধান প্রবর্তন করে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক।

জনাব আব্দুল বারী, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা এর বিশেষ পিপি আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** তদন্তকারী কর্মকর্তারা সঠিকভাবে তদন্ত করেন না এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী মনগড়া মত লিপিবদ্ধ করেন। ফলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত সাক্ষীসহ অন্যান্য সাক্ষীদের আদালতে হাজির করার ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা কম হওয়ায় মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে।

সুপারিশ: এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের আরো বেশি নজর দেয়া উচিত।

২। **সমস্যা:** পুরুষ ডাক্তার দ্বারা মেডিক্যাল পরীক্ষা করায় ধর্ষণ মামলার ভিকটিম হাসপাতালে যেতে চান না। ফলে বিচার দেয়া যায় না।

সুপারিশ: নারী ডাক্তার দ্বারা ধর্ষণ মামলার ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক।

অন্যান্য সুপারিশ: এই আইনের অধীন মামলাসমূহ আপোসযোগ্য করা হলে আরো বেশি নির্যাতিত হবেন। তাই আপোসযোগ্য করা যাবে না। এই মামলার অধীন দায়েরকৃত মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত জামিন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন ট্রাইব্যুনালের বিচারক কর্তৃক শ্রবণযোগ্য করা আবশ্যক।

বেগম জেসমিন আরা, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** এডভোকেটদের অর্থ লোভ এবং ভুল নির্দেশনার কারণে এই আইনের অধীন মামলার ভিকটিমরা নির্যাতিত হয়ে থাকে। ফলে তারা ন্যায়বিচার বঞ্চিত হন।

সুপারিশ: এই বিষয়ে এডভোকেটদের জবাবদিহিতা বার কাউন্সিল কর্তৃক নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দেয়া প্রয়োজন।

২। **সমস্যা:** মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেতে ঘুষ দেয়া সহ নানা ধরনের হয়রানি হতে হয়। ডাক্তার সাক্ষীগণকে অনেক চেষ্টা করেও আদালতে হাজির করা যায় না। এমনকি ধর্ষণ মামলাগুলো এই কারণে নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ বিলম্ব হয়। ফলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়।

সুপারিশ: এই বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট থেকে নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।

৩। **সমস্যা:** মামলা আপোসযোগ্য করলে হয়রানি বেড়ে যেতে পারে। আবার আপোসযোগ্য না হওয়ায় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় না।

সুপারিশ: আপোসযোগ্য না করে বরং পরপর ৫ টি ধার্য তারিখে নালিশকারী আদালতে না এলে মামলা খারিজ করার বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে অথবা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে মামলা আপোসযোগ্য করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪। **সমস্যা:** তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সাক্ষীদের জবানবন্দী থানায় বসে নিজের মত করে লিপিবদ্ধ করেন। ফলে প্রকৃত ঘটনা আড়ালে চলে যায় এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়।

সুপারিশ: প্রত্যেকটি মামলার কেস ডায়েরি (সিডি) অনলাইনে প্রদর্শনের বিধান প্রবর্তন করা উচিত। তাতে তদন্তের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং একই সাথে সাক্ষীদের মোবাইল নম্বর পুলিশ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে সাক্ষীদেরকে যথাসময়ে আদালতে হাজির করা হয়।

৫। **সমস্যা:** একই পক্ষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক উদ্ভূত বিভিন্ন আদালতে বিদ্যমান মামলাসমূহের কারণে মামলা বিলম্বিত হয়।

সুপারিশ: একটি ট্রাইব্যুনালে একই পক্ষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক উদ্ভূত বিভিন্ন চলমান মামলাসমূহ বিচার করার বিধান প্রবর্তন করা উচিত।

৬। **সমস্যা:** নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পেশকার, সেরেস্তাদার সহ অন্যান্য কর্মচারীদের চাকুরী বদলীযোগ্য না হওয়ায় তারা নানান ধরনের দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। ফলে তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না এবং তাদের কারণে বিচার প্রার্থী জনগণ নানানভাবে হয়রানির শিকার হন। ফলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়।

সুপারিশ: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পেশকার, সেরেস্তাদার সহ অন্যান্য কর্মচারীদের চাকুরী বদলীযোগ্য করা প্রয়োজন।

অন্যান্য সুপারিশ: ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রদত্ত জামিন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন শুনানীর ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের বিচারকের কাছে থাকা উচিত।

বেগম রোখসানা পারভীন, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, শরীয়তপুর বলেন:

১। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করার বিষয়ে কিংবা অন্যান্য সাক্ষীগণকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থাপনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করলেই সাক্ষী হাজিরার সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

২। ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ নেয়া শুরু করলে ডাক্তার সাক্ষীগণ অবশ্যই সাক্ষী দিতে আসবেন। জখমী সনদ (মেডিক্যেল সার্টিফিকেট) সংক্রান্ত আইনগত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনকে জানিয়ে দিলেই এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

৩। যেসব ভিকটিমের আর্থিক সংগতি নেই তাদের ডিএনএ টেস্টের খরচ এখন সিআইডি (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট) থেকে প্রদান করা হচ্ছে।

জনাব আলী আসগর স্বপন, বিশেষ সরকারী কৌসুলী (পিপি), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫, ঢাকা আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** এই আইন অনুযায়ী দায়েরকৃত মামলাগুলোতে ভিকটিমের পক্ষে বিশেষ সরকারী কৌসুলী এর আদালতে প্রতিনিধিত্ব করার কথা অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ভিকটিমের পক্ষে ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ব্যক্তিগত আইনজীবীগণকে আর পরবর্তীতে মামলার কার্যক্রমে খুঁজে পাওয়া যায় না যার ফলে মামলা বিলম্বিত হয়।

সুপারিশ: ভিকটিমগণের পক্ষে ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ এর বিষয়ে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

অন্যান্য সুপারিশ: ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে আসামীদের জামিন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করছেন, যা এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এই আইনের ৩৩ ধারায় বিধৃত বিধান অনুযায়ী কোন বিধিমালা দীর্ঘ ১৬ বছরেও প্রণীত হয় নাই। যার ফলে নানান প্রায়োগিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটছে। এই বিধিমালা প্রণয়ন করলেই প্রায়োগিক সমস্যাসমূহের অধিকাংশেরই সমাধান হবে।

জনাব সৈয়দ জাহেদ মনসুর, বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, গাজীপুর আলোচনায় অংশ নিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যা ও তা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন:

১। **সমস্যা:** এই আইনের ৪ ধারায় 'দহনকারী পদার্থ 'এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। এর ফলে বিচার কার্যক্রমে আইনগত জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হচ্ছে।

সুপারিশ: অবিলম্বে 'দহনকারী পদার্থ 'এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এই আইনের ৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

২। **সমস্যা:** এই আইনের ১১ (ক) ধারায় যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে শুধু মৃত্যুদন্ডের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যার ফলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না ফলশ্রুতিতে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

সুপারিশ: অবিলম্বে এই আইনের ১১ (ক) ধারায় বর্ণিত অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি কারাদন্ড এবং জরিমানার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

৩। **সমস্যা:** এই মামলার অধীন দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত ১৫ দিন (ক্ষেত্র বিশেষে ৬০ দিন পর্যন্ত) এর মধ্যে দাখিল করার বিধান থাকা স্বত্বেও ৬ মাস কিংবা ১ বছরেও তদন্ত প্রতিবেদন থানা থেকে দাখিল করা হয় না যার ফলে এই মামলাগুলো বছরের পর বছর আদালতে অনিষ্পন্ন অবস্থায় জমে থাকে অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। এই মামলাগুলোর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে। অথচ এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন মনোযোগী না হয়ে এই আইনের বিধি-বিধানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে চলেছেন।

সুপারিশ: এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন যাতে আরো বেশি আন্তরিক এবং কঠোর হন তদসংক্রান্তে জরুরী ভিত্তিতে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি দিকনির্দেশনা জারী করা আবশ্যক ।

৪ । **সমস্যা:** সাক্ষীগণকে আদালতে হাজির করার ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ । এ বিষয়ে তাদের কোন জবাবদিহিতা না থাকায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটছে ।

সুপারিশ: সাক্ষী হাজির করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের কাছে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জরুরী ভিত্তিতে জারী করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা আবশ্যক ।

৫ । **সমস্যা:** যে সব হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ আছে সেইসব ক্ষেত্রে ডাক্তার সাক্ষীদের হাজির করার ব্যাপারে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় কেননা সিভিল সার্জন বলেন যে এটি পরিচালকের দায়িত্ব অপরদিকে পরিচালক বলেন যে এটি সিভিল সার্জন এর দায়িত্ব । এর ফলে ডাক্তার সাক্ষীর অভাবে মামলায় ন্যায়বিচার প্রদান করা যায় না এবং মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায় ।

সুপারিশ: যে সব হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ আছে সেইসব ক্ষেত্রে ডাক্তার সাক্ষীগণকে হাজির করার দায়িত্ব কার হবে সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা জরুরী ভিত্তিতে জারী করা আবশ্যক ।

৬ । **সমস্যা:** ২০১৪ সালের ডিএনএ টেস্ট সংক্রান্তে আইন প্রণীত হয়েছে । কিন্তু এই আইনে ডিএনএ টেস্ট সংক্রান্তে ডাক্তারদের আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে । এর ফলে এরুপ সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে এমন মামলাগুলোর ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না ।

সুপারিশ: ডিএনএ সংক্রান্তে ডাক্তারগণকে আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের বিচারককে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণের স্বার্থে প্রদান করা অত্যাবশ্যক ।

৭ । **সমস্যা:** এই আইনের ৭ ও ৮ ধারায় শুধু অপহরণের জন্য শাস্তির বিধান করা আছে । কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একজন নারী ও শিশুকে অপহরণের পর আসামীরা হত্যা করে থাকেন । এরূপ ক্ষেত্রে এই ট্রাইব্যুনাল শুধু অপহরণের বিচার করার অধিকারী হলেও হত্যা করার অপরাধ বিচার করার এখতিয়ার সম্পন্ন কিনা সেই বিষয়ে আইনগত এবং প্রায়োগিক জটিলতা উদ্ভব হয় । যার ফলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয় ।

সুপারিশ: এই আইনের ৭ এবং ৮ ধারায় অপহরণ এর সাথে অপহরণপূর্বক হত্যা এর বিষয়টি অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে আইনটি সংশোধন করা জরুরী ।

সম্মানিত বিশেষজ্ঞ আলোচক **মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার**, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট মহোদয় বলেনঃ

এই আইনের অধীন শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স বিদ্যমান শিশু আইনের সাথে সংঘাতপূর্ণ হওয়ায় অতি দ্রুত নির্ধারণ করা আবশ্যক কোন ক্ষেত্রে শিশু সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো এই ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হবে এবং কোন ক্ষেত্রে শিশু আদালত কর্তৃক বিচার্য হবে ।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলাসমূহের ক্ষেত্রে এই আইনের ১৮, ১৯ এবং ২৭ ধারার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ (অপরাধ আমলে গ্রহণ, অপরাধের তদন্ত এবং নারাজি দরখাস্ত সংক্রান্ত) প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত জটিলতাসমূহ নিরসনকল্পে ট্রাইব্যুনালসমূহের বিচারকবৃন্দ, বিশেষ পিপি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে মাননীয় বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক Criminal Miscellaneous Case No.11546 of 2015, Mst. Anjuara Khanam @ Anju Versus The State and another মামলায় গত ০৮/০৭/২০১৫ খ্রি:তারিখে প্রদত্ত রায়টি অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করেন । উক্ত মামলার রায়ের আলোকে তিনি অংশগ্রহণকারীগণকে অবগত করেন যে উপরোক্ত রায়ের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত ০৪ (চার) টি বিষয় নিষ্পন্ন করা হয়েছে:

০১ । আমলে গ্রহণের সুবিধার্থে ট্রাইব্যুনাল এই আইনের ২৭ ধারার অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিষয়ে নারাজি আবেদন বিবেচনা করতে পারবেন ।

০২। এই আইনের ২৭ ধারার অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ নালিশকারী/এজহারকারী বা ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত নারাজি দরখাস্তের প্রেক্ষিতে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এর ২০০ ধারার অধীন পরীক্ষাকরণের প্রয়োজন নাই।

০৩। ট্রাইব্যুনাল এই আইনের ২৭ (১ক) এর অধীনে কোনো ইনকোয়ারী স্থগিত ঘোষণা করে প্রাপ্ত নালিশি দরখাস্তটি মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অপর যে কোন একজন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ সহযোগে সংশ্লিষ্ট থানায় ফেরত প্রদান করতে পারবেন অথবা অন্য যে কোন তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন, এবং

০৪। কোনো ইনকোয়ারী রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট মনে হয় যে আনীত অভিযোগের ধরন বিবেচনায় প্রকৃত অপরাধ উদঘাটনে শুধু ইনকোয়ারী যথেষ্ট নয় তবে তিনি নালিশি দরখাস্তটি মামলা গ্রহনে অস্বীকৃতি জানানো পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অপর যে কোন একজন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ সহযোগে সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করতে পারবেন অথবা অন্য যে কোন তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন।

সম্মানিত বিশেষজ্ঞ আলোচক **মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম**, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বলেনঃ

১। এই আইনে সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা যে ভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে অন্য কোন আইনে সে ভাবে দেখা যায় না। এই আইনের কিছু কিছু ধারার অপরাধ আপোসযোগ্য করা উচিত, তাতে মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে।

২। এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে আইনে অর্পিত দায়িত্বসমূহ বিশেষ পিপি (পাবলিক প্রসিকিউটর) এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের অবহেলার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আদেশ একটি মামলার রায়ে আমরা প্রদান করেছি যা অতিশীঘ্রই বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে এবং আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হবে। এই সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট বিচারকগণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে ইতোমধ্যেই পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

৩। ডাক্তার সাক্ষীগণ এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীগণ আদালতে সাক্ষ্য দিতে না আসলে পেনাল কোডসহ সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ প্রয়োগ করে দুই একবার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে তাঁরা সাবধান হয়ে যাবেন তখন আর বিলম্ব হবে না।

৪। এরকম অধিবেশনগুলো নিয়মিত আয়োজন করলে মাঠ পর্যায়ে প্রায়োগিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ এবং নিরসন তরান্বিত হবে ফলস্বরুপ ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে এবং মামলাজট হ্রাস পাবে।

অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি এবং সঞ্চালক **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী**, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন যে মিথ্যা মামলা দায়ের হচ্ছে মনে করে পূর্ব-ধারণাপ্রসুত (Judgemental) হয়ে বিচার করা যাবে না। বিচার করতে হবে পদ্ধতি মেনে কারণ নারী ও শিশুরা আমাদের সমাজে ঝুঁকিপূর্ণ (Vulnerable) অবস্থায় রয়েছেন। পারিবারিক নির্যাতন এই সমাজে বিদ্যমান এবং সে গুলোতে ননদ, দেবর এবং শ্বশুর- শাশুড়িরাও অনেক সময় জড়িত থাকেন।

সাক্ষী আনয়ন, মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং তদন্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনায় বসলেই সেগুলো সমাধান করা সম্ভব হবে।

বিদ্যমান শিশু আইনটি ভালো হয়নি, অনেক ভুল আছে। এটি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান আছে। শিশু আইনে 'শিশু অপরাধীদের' বিচার হবে এমন বিধানই প্রবর্তন হতে যাচ্ছে। তবে একটি বিষয় আপাতত অনুসরণ করা যেতে পারে যে, যে আইনে যে বয়স উল্লেখ করা হয়েছে সেই আইনের অধীন অপরাধের বিচার করার ক্ষেত্রে সেই উল্লেখিত বয়সই বিবেচিত হবে।

অধিবেশনে আলোচিত সমস্যা ও সুপারিশ

১। অনেক মামলায় (বিশেষত ধর্ষণের অভিযোগ সম্বলিত মামলায়) দেখা যায় যে, ধর্ষণের শিকার নারী এবং ধর্ষণের ফলে জন্মানো সন্তান এর জীবনযাপনের কোন অবলম্বন থাকে না।

সুপারিশ: এই ধরনের ব্যতিক্রমি ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে ভিকটিমদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য পুনর্বাসনমূলক আইনগত সহায়তা (Rehabilitative Legal Aid) প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

২। অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য না হওয়ায় পক্ষগণের ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় না।

সুপারিশ: এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আপোসযোগ্য করা উচিত অথবা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোসযোগ্য হিসেবে বিধান করা উচিত।

৩। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স মানব পাচার আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন এবং শিশু আইন এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় প্রায়োগিক জটিলতা দেখা দিয়েছে।

সুপারিশ: এ বিষয়ে অবিলম্বে সমতা সাধন করা আবশ্যক।

৪। একই পক্ষগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের মামলা (দেনমোহর, যৌতুক দাবী, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রভৃতি) একই সময়ে বিভিন্ন আদালতে চলতে থাকে ফলে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়।

সুপারিশ: একই পক্ষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সকল মামলা একটি আদালতে বিচারের বিধান প্রবর্তন করা হলে জটিলতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যয়িত সময় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

৫। ধর্ষণের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তারদের দ্বারা মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় ভিকটিমগণ মেডিকেলে যেতে আগ্রহী হন না এবং ধর্ষণ পরবর্তী দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ ধরনের পরীক্ষা সম্পন্ন করা প্রয়োজন মর্মে ভিকটিমদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় এ ধরনের মামলায় মেডিকেল সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না। ফলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা যায় না।

সুপারিশ: নারী ডাক্তার দ্বারা এধরনের পরীক্ষাকরণ বাধ্যতামূলক করা উচিত এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের পরীক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যাপক সচেতনামূলক প্রচার প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনে বিশেষ বি.সি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে নারী ডাক্তারগণকে ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তার হিসেবে নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ফরেনসিক টেস্টে নারী ডাক্তারগণের অপ্রতুলতা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৬। তদন্ত রিপোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করার বিধান থাকলেও ০১ (এক) বছরেও তা দাখিল করা হয় না। ফলে মামলা বিলম্বিত হয়।

সুপারিশ: এ বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার এহেন গাফিলতির বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৭। ডাক্তার সাক্ষীদের তলব করেও আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য হাজির করা যায় না এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট যথাসময়ে পাওয়া যায় না। ফলে মামলা বিলম্বিত হয়।

সুপারিশ: এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারগণের সুস্পষ্ট জবাবদিহিতার বিধান প্রবর্তন করা আবশ্যক এবং জখমী সনদপত্রে প্রত্যেক ডাক্তারের স্বাক্ষরের সাথে তাদের মোবাইল ফোন নম্বর উল্লেখ করার বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৮। এই আইনের ১১ (ক) ধারায় যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে শুধুমাত্র মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধান রয়েছে। যার ফলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় সাজা দেওয়া যায় না। যা মানবাধিকার পরিপন্থী।

সুপারিশ: উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) and others Vs Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Home Affairs, Dhaka and others, 1 SCOB (AD)1, 67 DLR (AD) (2015) Page 185 মামলায় যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি শুধুমাত্র মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধানকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় অবৈধ ঘোষণা

করেছেন। উক্ত রায়ের আলোকে এই আইনে সংশোধীন আনয়নপূর্বক এই আইনের ১১(ক) ধারায় যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে জরিমানাসহ কারাদন্ড হতে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৯। এ আইনে বিধান থাকা সত্বেও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ জামিন শুনানি করছেন এবং তাঁদের জামিনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ দায়রা জজ রিভিশন শুনানী করছেন যা জটিলতার সৃষ্টি করছে।

সুপারিশঃ রিভিশন ট্রাইব্যুনালের বিচারক কর্তৃক শ্রবণযোগ্য করা উচিত। এতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির হার তরান্বিত হবে।

১০। এই আইনের ৪ ধারায় 'দহনকারী পদার্থ'এর কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। এর ফলে বিচার কার্যক্রমে আইনগত জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হচ্ছে।

সুপারিশঃ অবিলম্বে 'দহনকারী পদার্থ'এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এই আইনের ৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

১১। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের কর্মচারীদের চাকুরী বদলীযোগ্য না হওয়ায় তারা নানান ধরনের দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। ফলে তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না এবং তাদের কারণে বিচার প্রার্থী জনগণ নানানভাবে হয়রানির সৃষ্টি হন। ফলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়।

সুপারিশঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের কর্মচারীদের চাকুরী বদলীযোগ্য করা অত্যাবশ্যক।

১২। অনেক সময় ভিকটিমদের ডিএনএ টেস্ট করার ফি প্রদান করার আর্থিক সংগতি থাকে না। ফলে মামলায় এরূপ টেস্টের রিপোর্ট এর অভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা যায় না।

সুপারিশঃ আর্থিক সংগতিহীন ভিকটিমদের ডিএনএ টেস্টের ফিস সরকারী কোষাগার থেকে প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার কালেকটরকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণকে প্রদান করে বিধান প্রবর্তন করা অতীব জরুরী।

১৩। এই আইনের ৩৩ ধারায় একটি বিধিমালা প্রণয়নের কথা বলা আছে অথচ ১৬ বছরেও তা প্রণয়ন করা হয়নি। যার ফলে বিভিন্ন প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

সুপারিশঃ অবিলম্বে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

কর্ম-অধিবেশন-৩

“ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ”

সভাপতি ও সঞ্চালক:

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আশফাকুল ইসলাম
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আলোচক:

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন:

জনাব তেহসিন ইফতেখার

বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ময়মনসিংহ

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, সিলেট

‘ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত কর্ম-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আশফাকুল ইসলাম** মহোদয় এবং উক্ত অধিবেশনে আলোচক ছিলেন **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস**। অধিবেশনটি সমন্বয় করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগের রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ জাকির হোসেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় এর যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার দু’জন কর্মকর্তা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের ৪৩ (তেঁতাল্লিশ) জন বিচারক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। জনাব তেহসিন ইফতেখার এবং জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তাঁরা ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা এবং কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করেন। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের দূর্বলতাসমূহ উপস্থাপনের পাশাপাশি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালসমূহের কর্মপরিবেশ উন্নতকরণার্থে গৃহীতব্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের উপস্থাপনা সমাপ্ত হয়।

অধিবশনের সভাপতি **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আশফাকুল ইসলাম** তাঁর বক্তব্যে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন এবং বলেন মামলার সংখ্যা অনুপাতে বিচারক সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। তিনি আরও বলেন আইনগত, অবকাঠামোগত ও লজিস্টিক সাপোর্টের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিচার কাজে আমাদের বিচারকদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মনোনিবেশ করতে হবে। যাতে করে বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ কমে।

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস রেকর্ডস অব রাইটস (খতিয়ান) এর ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখপূর্বক বক্তব্য প্রদান করেন এবং ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার কারণসহ এর গুরুত্বও তুলে ধরেন।

মাননীয় বিচারপতি বর্ণনা করেন, ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলে ভূমির মালিকানা এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, “জঙ্গল পরিষ্কার করে যে এটিকে চাষযোগ্য করে তুলবে সে-ই ঐ জমির মালিক হবে।” শেরশাহ এর শাসনামলে প্রথমবারের মতো ভূমি পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন হয়। কিন্তু বৃটিশ আমলেই মূলত ভূমির মালিকানার তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও কৌশল প্রচলন করা হয়। এই অঞ্চলে Bengal Tenancy Act, 1855 এর ১০১ ধারার অধীনে Cadastral Survey এর মাধ্যমে প্রথম রেকর্ড-অব-রাইটস তথা সি.এস. খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় এবং ১৯৫০ সালের The

State Acquisition and Tenancy Act এর ১৭ ধারার অধীনে সংশোধিত রেকর্ডস-অব-রাইটস তথা এস.এ খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। The State Acquisition Rules, 1955 এর ১৮ বিধি অনুযায়ী একটি রেকর্ড-অব-রাইটস এ অবশ্যই প্রজার বা অধিকারীর বিস্তারিত বর্ণনা এবং তাদের উক্তরূপ অধিকারের ধরন, প্রেক্ষিত, শ্রেণী, পরিমাণ এবং প্রত্যেক প্রজা বা অধিকারী কর্তৃক অধিকৃত জমির চৌহদ্দি সহ অন্যান্য বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মাননীয় বিচারপতি আরো বলেন, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল হলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে রেকর্ড-অব-রাইটস সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ ফোরাম এবং দেওয়ানী আদালত এর একটি বিকল্প ব্যবস্থা। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কোন নতুন উদ্ভাবন নয় বরং The Bengal Tenancy Act এর ১০৬ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন রাজস্ব-আদালত এবং তৎপরবর্তী ১৯৭৫ সালের LXIV নং অধ্যাদেশ দ্বারা বাতিলকৃত SAT Act (East Pakistan Ordinance VIII of 1967 দ্বারা সৃষ্ট) এর 143A ধারার অধীন প্রদত্ত দেওয়ানী আদালতের স্পেশাল মিসসেলেনিয়াস জুরিসডিকশন এর একটি প্রতিস্থাপিত রূপ বা বাহক। এই ট্রাইব্যুনালের শুধুমাত্র শেষ রেকর্ড-অব-রাইটস তথা আর.এস রেকর্ড এর উপরেই এখতিয়ার থাকা উচিৎ। যদি পূর্ববর্তী কোন রেকর্ডের বিষয় কোন বিবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে উক্ত বিবাদের ক্ষেত্রে এই ট্রাইব্যুনালের কোন এখতিয়ার থাকবে না। এছাড়াও তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪ ধারার অধীনে শুধুমাত্র সরকার-ই ভাড়া নির্ধারণ এবং প্রজাগণের মধ্যে বিদ্যমান কিংবা উদ্ভব হতে পারে এমন গুরুতর বিবাদ মীমাংসা বা প্রতিহতকরণ বা কোন জেলা বা জেলার কোন অংশের বা কোন অঞ্চলের মোট প্রজার অর্ধেকাংশের আবেদনের প্রেক্ষিতে একজন রেভিনিউ অফিসারের (রাজস্ব কর্মকর্তা) দ্বারা রেকর্ড-অব-রাইটস প্রস্তুত বা রেকর্ড-অব-রাইটস সংশোধনের আদেশ দান করবেন। এরপর, সরকার ঐ আদেশটি অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশ করবেন এবং উক্তরূপ আদেশের প্রেক্ষিতে State Acquisition Rules, 1955 এর ২৬-৩০ বিধিসমূহের আলোকে রেকর্ড-অব-রাইটস প্রস্তুত বা সংশোধিত হবে।

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, SAT Act এর 144A ধারানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষ্য দ্বারা ভুল বলে প্রমাণিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ১৪৪ ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত রেকর্ড-অব-রাইটসকে সঠিক বলে গণ্য করতে হবে। ১৪৪ই ধারার বিস্তৃত ব্যাখ্যার অর্থ হলো রেকর্ড-অব-রাইটস প্রস্তুত বা সংশোধন এর আদেশ অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর হতে রেকর্ড-অব-রাইটস প্রকাশকরণ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে তদ্‌সংক্রান্ত চলমান কোন প্রক্রিয়ায় কোন দেওয়ানী আদালত হস্তক্ষেপ করবেন না। শুধু তাই নয়, যদি উক্ত তারিখের পর উক্তরূপ কোন মামলায় বা আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদত্ত হয় তবে উক্তরূপ রায়, ডিক্রি বা আদেশ এর কোন আইনগত কর্তৃত্ব থাকবে না এবং তা অকার্যকর হবে।

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়েরের পদ্ধতি এবং ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা:

SAT Act এর ১৪৪ ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত রেকর্ড-অব-রাইটস এর চূড়ান্ত প্রকাশনার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি যদি সংক্ষুব্ধ হন, তবে তিনি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে একটি মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবেন। এই মোকদ্দমাসমূহ আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন একজন যুগ্ম-জেলা জজ কর্তৃক বিচার্য্য হবে। মামলার বাহুল্য এড়ানোর নিমিত্ত অন্যান্য দেওয়ানী আদালতসমূহের বিপরীতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল প্রাধান্য পাবে যদি উক্ত মোকদ্দমাটি সর্বশেষ সংশোধিত রেকর্ড-অব-রাইটস সংক্রান্ত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যদি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার পূর্বে উক্তরূপ মোকদ্দমাসমূহ কোন দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা হয়ে থাকে তবে এই ট্রাইব্যুনালসমূহ প্রতিষ্ঠাকরণমাত্র যত দ্রুত সম্ভব উক্ত মোকদ্দমাসমূহ এই ট্রাইব্যুনালে বদলী করতে হবে। একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে উক্তরূপ প্রকাশনার তারিখ হতে অথবা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠাকরণের তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের মধ্যেই যেটি পরে ঘটে, এই ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। যাই হোক, ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে মোকদ্দমা দায়েরের জন্য উক্ত নির্ধারিত এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী এক বছর এর মধ্যে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিবাদমান রেকর্ড-অব-রাইটস টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করার এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে রেকর্ড-অব-রাইটসটিকে সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করার এবং প্রয়োজনীয় যে কোন আদেশ জারী করার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের রয়েছে।

ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

যদি কোন ব্যক্তি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, তবে তিনি ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে একটি আপীল দায়ের করতে পারবেন। SAT Act এর 145B ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণের জন্য আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবেন।

ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়েরের পদ্ধতি এবং অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা

যিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে কর্মরত আছেন বা কর্মরত ছিলেন এমন একজন বিচারক কর্তৃক এই ট্রাইব্যুনালসমূহ পরিচালিত হবে। অবশ্যই উক্তরূপ রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে এই ট্রাইব্যুনালসমূহে আপীল দায়ের করতে হবে; তবে, সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উক্তরূপ নির্ধারিত তিন মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যেও একটি আপীল গৃহীত হতে পারবে।

ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল এর বিরুদ্ধে কোথায় আপীল করতে হবে

145C ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল এর প্রদত্ত রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করা যাবে। যদি আপীল বিভাগ Leave to Appeal মঞ্জুর করেন।

ট্রাইব্যুনালসমূহের সংক্ষিপ্ত ক্ষমতাসমূহ

145D(1) ধারানুযায়ী একটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল অথবা একটি ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতাসমূহ ও Code of Civil procedure, 1908 (V of 1908) এর পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করবেন, যথা:

(১) সমন জারী করা এবং কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করণার্থে ক্ষমতা প্রয়োগকরণ এবং তাকে পরীক্ষাকরণ;

(২) কোন দলিলের Discovery and Production এর ক্ষেত্রে;

(৩) হলফনামাযোগে সাক্ষ্য উপস্থাপন;

(৪) যে কোন দপ্তর হতে যে কোন সরকারী নথি বা এর অনুলিপি তলবকরণ;

(৫) সাক্ষ্য গ্রহণ বা দলিল পরীক্ষাকরণের জন্য কমিশন প্রেরণ;

(৬) বিধিসমূহের অধীন নির্ধারিত অন্যান্য যে কোন বিষয়ের প্রেক্ষিতে;

(৭) ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁর আঞ্চলিক এখতিয়ারাধীন এলাকায় অবস্থিত একটি ট্রাইব্যুনালে চলমান একটি মামলা যে কোন পর্যায়ে লিখিত আদেশ দ্বারা অপর কোন ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে বদলী করতে পারবেন।

সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে প্রযোজ্য মতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশসমূহ চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

প্রাধান্য

বিষয়ের পরিপন্থী না হইলে এই আইনে বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ প্রাধান্য পাবে।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ল্যান্ড সার্ভেট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন জেলাওয়ারী বিচারাধীন মামলাসমূহের তুলনামূলক চিত্র:

ক্রঃ নং	জেলার নাম	মামলার জের	দায়ের	নিষ্পত্তি	বিদ্যমান মামলা
১	কিশোরগঞ্জ	৪৪৩৯০	১১	৬০	৪৪৩৪১
২	ময়মনসিংহ	৩৪৪৬৪	-	১১২১	৩৩৩৪৩
৩	নেত্রকোনা	২১৮৯০	১৪	১৭২	২১৭৩২
৪	জামালপুর	১৭৯২৪	১০	৯	১৭৯২৫
৫	টাংগাইল	১১৫২১	৫৫৫	১৬১	১১৯১৫
৬	চাঁদপুর	৯৬৭৭	৪৯৯	১০২	১০০৭৪
৭	ঢাকা	৭১৫৩	২৪	২০৬	৬৯৭১
৮	যশোর	৬০২১	৯১৪	১০৪	৬৮২২
৯	সাতক্ষীরা	৬২৮৪	২৩০	৬৯	৬৪৪৫
১০	শেরপুর	৬০৯৫	২৭	১৫৮	৫৯৬৪
১১	বাগেরহাট	৫৬৩৭	৩৯৪	৮২	৫৯৪৯
১২	গোপালগঞ্জ	৫৫৬২	২৭১	১১৮	৫৭১৫
১৩	খুলনা	৫১৪৯	৩০২	১৪১	৫৩১০
১৪	নোয়াখালী	৫১৩৯	১৬৮	৬৩	৫২৪৪
১৫	বগুড়া	৪৮৪৫	২৮১	১৫৮	৪৯৬৮
১৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৮২৪	১৪৯	১৩৮	৪৮৩৫
১৭	রংপুর	৩৮৫৭	৯২৮	২৪৮	৪৫৩৭
১৮	কুমিল্লা	৪৩১১	৪১০	২৬৩	৪৪৫৮
১৯	শরিয়তপুর	৩৫৪৮	৪৭৭	৩৩	৩৯৯২
২০	লক্ষীপুর	৩৮৯৯	৯১	২৯৩	৩৬৯৭
২১	বরিশাল	২৯৫৮	১১১	১৯০	২৮৭৯
২২	ফরিদপুর	২৬৫১	২৬৬	৯০	২৮২৭
২৩	হবিগঞ্জ	২৪৬৪	৩০৫	৮১	২৬৮৮
২৪	মাগুড়া	২৪৫২	৩৩১	২০১	২৫৮২
২৫	পাবনা	২৩৪২	৯৫	১৫৪	২২৮৩
২৬	সিলেট	১৯৯৩	৩৭১	৯৭	২২৬৭
২৭	পিরোজপুর	১৯১৪	২২৩	৭৭	২০৬০
২৮	রাজবাড়ি	১৭৮৯	৭৮	৩৬	১৮৩১
২৯	ঝালকাঠি	১৬০৪	১০২	৪৬	১৬৬০
৩০	মাদারীপুর	১৬২৮	৭৮	৮১	১৬২৫
৩১	জয়পুরহাট	১৪০৭	২১০	৯৬	১৫২১
৩২	মৌলভীবাজার	১২০৯	২০০	২৫	১৩৮৪
৩৩	ঝিনাইদহ	১২১২	১৯৯	৫৬	১৩৫৫
৩৪	ফেনী	১২৬৭	২৫	১১৮	১১৭৪
৩৫	গাইবান্ধা	১১২৫	৮১	২১৮	৯৮৮
৩৬	ভোলা	৭৭৪	১৫৬	৪৮	৮৮২
৩৭	কুড়িগ্রাম	৮৫৩	-	২৮	৮২৫
৩৮	সিরাজগঞ্জ	৮৭০	১৬	১০৫	৭৮১
৩৯	নড়াইল	৭১০	৫৪	১২	৭৫২
৪০	নীলফামারী	৪০৭	৪৩	৩৩	৪১৭
৪১	সুনামগঞ্জ	৩০৯	৮৩	১৯	৩৭৩
৪২	লালমনিরহাট	৩১৯	৬৪	৫৬	৩২৭
৪৩	নরসিংদী	৬১	-	৬১	০
	মোট =	**২৪৪৫০৮**	**৮৮৪৬**	**৫৬২৭**	**২৪৭৭১৮**

আলোচনা পর্ব

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারীগণ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালসমূহ পরিচালনাকালে তাঁরা যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন সেইসব সমস্যা এবং এর প্রেক্ষিতে তাদের বক্তব্য, সুপারিশ ও মতামতসমূহ তুলে ধরেন। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বিচারকগণের সংখ্যা এবং বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান মামলার সংখ্যা সংক্রান্ত প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীগণ মতামত প্রকাশ করেন যে, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ মামলার ভারে জর্জরিত এবং শুধুমাত্র ৪৩ জন বিচারক এর দ্বারা এই বিশাল মামলাজট নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। তাই প্রত্যেক জেলায় মামলার সংখ্যানুপাতে যথাযথ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের জন্য প্রতি ১৫০০ মামলার বিপরীতে একজন বিচারক নিয়োগ করা উচিত।

জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা, বলেন আরজী সংশোধন, পক্ষ সংযোজন ও স্থলাভিষিক্তকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশসমূহের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রধান দূর্বলতা এই যে, ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত আদেশসমূহ ডেপুটি কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট রেভিনিউ অফিসার (রাজস্ব কর্মকর্তা) উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তামিল করেন না। উক্তরূপ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ট্রাইব্যুনালের আদেশ পালনে অনীহা প্রদর্শনকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তিনি সুপারিশ করেন যে, ট্রাইব্যুনালের আদেশ অমান্যকারীগণকে সাজা প্রদানের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি ও আদেশসমূহ কার্যকর করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

জনাব শিমুল বিশ্বাস, বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, মাগুরা, ২৯টি জেলায় অবস্থিত ট্রাইব্যুনালসমূহে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে নতুন কর্মচারী বিশেষত সেরেস্তাদার এর পদ সৃষ্টি করার জন্যও সুপারিশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে শুধুমাত্র একজন প্রসেস সার্ভার থাকায় এত বেশী সংখ্যক মামলার বিপরীতে তার পক্ষে প্রসেসসমূহ জারী করা প্রায় অসম্ভব।

বেগম মোছাম্মৎ রোকশানা বেগম হেপী, বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, কিশোরগঞ্জ, উল্লেখ করেন যে, কিশোরগঞ্জে ৪৪,০০০ (চুয়াল্লিশ হাজার) এর অধিক মামলা বিচারাধীন কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নেই। তিনি বলেন, যদিও SAT Act এ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে কিন্তু প্রয়োজন থাকা স্বত্বেও অদ্যাবধি কোন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়নি।

জনাব ফেরদৌস ওয়াহিদ, বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, লালমনিরহাট, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, যথাসময়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে গেজেট নোটিফিকেশনগুলো প্রেরণ করে না ফলে ট্রাইব্যুনাল তার দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। তাদের বক্তব্যের সূত্র ধরে মাননীয় সভাপতি ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন না করার ভয়ঙ্কর ফল তুলে ধরেন। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন না করার কারণে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর বৈধতা ও এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করে Writ of Certiorari দায়ের করেন এবং ফলশ্রুতিতে Writ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতসমূহ মামলায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি আরো যোগ করেন যে, কোন অবস্থাতেই Writ এখতিয়ার প্রয়োগকারী আদালত আপীল আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। ফলস্বরুপ বিবাদমান পক্ষগণ Writ এখতিয়ার প্রয়োগকারী আদালতে দখল সংক্রান্তে প্রকৃত ঘটনা উপস্থাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বিচারপতি মহোদয় অনতিবিলম্বে ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। এই পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অবহিত করেন, ইতোমধ্যেই ভূমি মন্ত্রণালয় ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে এবং তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই সারাদেশে ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে।

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, নেত্রেকোনা, এর বিচারক **জনাব কামাল হোসেন** জানতে চান মানচিত্র সংশোধন সংক্রান্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের আছে কি না **জনাব তায়েব আলী,** বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, কুড়িগ্রাম, বলেন, যেহেতু মানচিত্র সংশোধন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য পৃথক ফোরাম রয়েছে তাই এই ধরনের মামলা নিষ্পত্তির এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের নেই। এর প্রেক্ষিতে **জনাব মোঃ জাকির হোসেন,** রেজিস্ট্রার, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বলেন যে, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের যে শুধু খতিয়ান সংশোধন সংক্রান্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার আছে তাই নয় বরং মানচিত্র সংশোধনের মামলা বিচার করারও এখতিয়ার রয়েছে কেন না রেকর্ড-অব-রাইটস এ খতিয়ান ও মানচিত্র উভয়ই অন্তর্ভূক্ত।

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর দূর্বলতাসমূহ

অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের নিম্নোক্ত দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত হয়ঃ

(১) অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীগণের মতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত সরকার কোন বিধিমালা প্রণয়ন করেনি। ফলশ্রুতিতে, পর্যাপ্ত আইনের অভাবে এত বিপুল সংখ্যক মামলা বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষত আরজী সংশোধন, পক্ষ স্থলাভিষিক্তকরণ বা সংযোজন প্রভৃতি বিষয়ে ট্রাইব্যুনালকে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

(২) সরকার কর্তৃক মামলাকারী জনগণের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোর নিমিত্ত কোন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অদ্যাবধি স্থাপিত হয় নাই।

(৩) XVIIA অধ্যায়ের 145D ধারায় ট্রাইব্যুনাল এর ক্ষমতা এবং পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মোকদ্দমা বা আপীলসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে একটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল বা একটি ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করবেন এবং Code of Civil Procedure, 1908 এর পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করবেন। যখন ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন পক্ষ কর্তৃক কোন মোকদ্দমায় XVIIA অধ্যায়ের বিধৃত বিধানবহির্ভূত কোন দরখাস্ত দাখিল করা হয় তখন ট্রাইব্যুনাল Code of Civil Procedure এর বিধানের প্রয়োগ যোগ্যতা নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন।

(৪) বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশসমূহের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।ট্রাইব্যুনালের অন্যতম প্রধান একটি দূর্বলতা হলো ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ডেপুটি কমিশনার বা রেভিনিউ অফিসার (রাজস্ব কর্মকর্তা) কর্তৃক যথাযথভাবে বা যথাসময়ে প্রতিপালিত হয় না এবং প্রদত্ত আদেশসমূহ কার্যকরের যথাযথ ক্ষমতার অভাব থাকায় ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

(৫) বিদ্যমান আইনের বিধানানুযায়ী মোকদ্দমার কোনো পক্ষের মৃত্যুতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে বা মৃত ব্যক্তির নাম কর্তন করতে পারেন না। ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন মোকদ্দমায় কোন প্রয়োজনীয় নতুন পক্ষকে যুক্ত করতেও ট্রাইব্যুনাল অপারগ। কোন সুনির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণার্থে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রয়োগকৃত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা' ট্রাইব্যুনাল বরাবর হস্তান্তরিত হয় নাই।

(৬) প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে সরদার আমীনগণ এবং রেভিনিউ অফিসারগণ অবৈধ সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা রেকর্ড-অব-রাইটস প্রস্তুত করে থাকেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাদের চাহিদামত রেকর্ড-অব-রাইটস প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে থাকেন। ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন বা তদন্ত ব্যতিরেকে কোনভাবেই পক্ষগণের অভিযোগের সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু XVIIA অধ্যায়ে নালিশি জমি সংক্রান্ত তদন্ত বা পরিদর্শনের নিমিত্ত কমিশনার নিয়োগের কোন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

(৭) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ মামলার ভারে জর্জরিত এবং মাত্র ৪৩ জন বিচারক দ্বারা এত বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা প্রায় অসম্ভব। তাই বিদ্যমান মামলার সংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারকের অভাবই ট্রাইব্যুনালসমূহের যথাযথ কার্যকরী ভূমিকা পালন না করতে পারার অন্যতম একটি কারণ।

(৮) ২৯টি জেলার ট্রাইব্যুনালে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নেই এবং এমনকি ট্রাইব্যুনালে সেরেস্তাদার এর পদও নেই। প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যার অনুপাতে বিদ্যমান মাত্র একজন প্রসেস সার্ভার এর পদও অপ্রতুল।

(৯) ভূমি মন্ত্রণালয় যথাযথ সময়ের মধ্যে গেজেট নোটিফিকেশন গুলো ট্রাইব্যুনালে সরবরাহ করেন না এবং ফলশ্রুতিতে ট্রাইব্যুনাল তার দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারে না।

(১০) এই আইনে নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ বিশেষ তামাদি মেয়াদ হওয়ায় ট্রাইব্যুনালসমূহে বিধিবদ্ধ তামাদি মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যায় না। তাই Limitation Act, 1908 এর ২৯(২) ধারার আলোকে তামাদির মেয়াদ বর্ধিতকরণের কোন সুযোগ এক্ষেত্রে নাই।

(১১) এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বশেষে রেকর্ড-অব-রাইটস সংশোধন সংক্রান্ত দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(১২) এই ট্রাইব্যুনালকে শুধুমাত্র একটি রেকর্ড এর নির্ভূলতা বা ত্রুটিযুক্ততা ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছে, কোন নালিশি জমিতে কোন ব্যক্তির অধিকার বা স্বত্ব ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই।

(১৩) এই ট্রাইব্যুনাল কোন অন্তবর্তী প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারে না।

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ

(১) ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে এবং ট্রাইব্যুনালসমূহ কর্তৃক বিচারকৃত মোকদ্দমাসমূহে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণার্থে জরুরী হওয়া স্বত্ত্বেও অদ্যাবধি সরকার কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়ন করা হয় নাই। তথাপিও ট্রাইব্যুনালসমূহ বিচারিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ও রায় প্রদান করে চলেছে। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(২) আইনে বলা হয়েছে, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে একটি আপীল দায়ের করতে পারবেন। কিন্তু সংক্ষুব্ধ পক্ষগণের জন্য এমন কোন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল নেই। সুতরাং অনতিবিলম্বে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(৩) মামলার সংখ্যানুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিৎ। প্রতি ১৫০০ মামলার জন্য কমপক্ষে একজন বিচারক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(৪) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে রেকর্ড-অব-রাইটস সংশোধন করার নির্দেশ দিতে পারেন। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের আদেশ পালন না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন আদালত অবমাননার কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই। সুতরাং, আদালত অবমাননার কার্যক্রম গ্রহণ করার এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রতিপালন না করার জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালকে প্রদানের জন্য আইন সংশোধন করা উচিত। একইসাথে ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত ডিক্রি জারীর জন্য পৃথক 'জারী প্রক্রিয়া' সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। বিদ্যমান আইন স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিৎ এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা প্রয়োজন।

(৫) ২৯ জেলার ট্রাইব্যুনালে পর্যাপ্ত কর্মচারী নেই। সুতরাং, প্রত্যেক ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ দেয়া উচিত। প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে সেরেস্তাদার এর পদসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(৬) প্রসেস সার্ভার এর পদ মাত্র একটি। সুতরাং, পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রসেস সার্ভার এর পদ সৃষ্টি করা উচিত।

(৭) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক যত দ্রুত সম্ভব বিভিন্ন গেজেট নোটিফিকেশনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

(৮) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (JATI)-এ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণের জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

কর্ম অধিবেশন-৪

''বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে বাধা ও উত্তরণের উপায়''

সভাপতি ও সঞ্চালক:

মাননীয় বিচারপতি জনাব সৌমেন্দ্র সরকার
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আলোচকবৃন্দ:

মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি জনাব কাজী রেজা-উল হক
হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন:

বেগম ফারজানা ইয়াসমিন
ডেপুটি রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সুপ্রীম কোর্ট মূল ভবনের কনফারেন্স রুমে যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং সহকারী জজ পর্যায়ের মোট ৩০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে বাধা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক কর্ম-অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় **বিচারপতি জনাব সৌমেন্দ্র সরকার**। এছাড়া **বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান** ও **বিচারপতি জনাব কাজী রেজা-উল হক** মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত কর্ম অধিবেশনকে সমৃদ্ধ করেছেন। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব গোলাম সারওয়ার এবং লেজিসলেটিভ এন্ড ড্রাফটিং বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম সচিব হাফিজ আহমেদ চৌধুরীসহ উপস্থিত বিচারকবৃন্দের মধ্য থেকে মোট ১৫ জন উক্ত কর্ম অধিবেশনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। অধিবেশনের প্রারম্ভিক উপস্থাপনা ও সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার **জনাব এস, এম, এরশাদুল আলম**।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার **বেগম ফারজানা ইয়াসমিন** ''Alternative Dispute Resolution (ADR) in Bangladesh: Challenges and Way Forward'' শিরোনামের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তিনি তার প্রবন্ধে মোট চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। যেমনঃ

- যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে মামলাজট নিরসনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগ;
- বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিকল্প পদ্ধতির অবস্থান ও বিভিন্ন আইনে তার প্রতিফলন;
- মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যর্থতার নিরিখে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা;

- বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ভূমিকা।

এছাড়া তিনি তার প্রবন্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৯এ ধারায় উল্লিখিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সফল প্রয়োগে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আইনজীবীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মামলার কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা ব্যাহত করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, মামলার এই বিশেষ স্তরে পক্ষসমূহের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে বিশেষ বিধান এবং সর্বোপরি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়নের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্ম অধিবেশনের এ পর্যায়ে মাননীয় সভাপতি অংশগ্রহণকারী বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে আদালতসমূহে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ এবং উক্ত প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরণের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোকপাতের জন্য আহবান জানান।

আলোচনা পর্ব

অংশগ্রহণকারী বিচারকগণকর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য এবং তাদের আলোচনায় প্রতিফলিত হওয়া বিষয়সমূহ নিম্নে বিধৃত হলোঃ

বেগম উম্মে সরাবন তহুরা, অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ফৌজদারি আদালতের বিচারক হিসেবে তিনি প্রায়শই অনুভব করেন যে দেওয়ানী কার্যবিধির অনুরূপ ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রচুর ফৌজদারি মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি সম্ভব হবে। বর্তমানে এ ধরনের বিধান না থাকার দরুণ আপোস অযোগ্য ধারায় চার্জ গঠন হলে কোন ফৌজদারি মামলা পরবর্তীতে আপোসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না। যার ফলে আইনজীবীগণ কোন মামলায় আপোস হলে সাক্ষী রি-কল করে তাদের পূর্বে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিপরীতে নতুন সাক্ষ্যের অবতারণা করেন, যা প্রকারান্তরে আদালতে মিথ্যাচারিতার সামিল। তাই, ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত হলে কিংবা আপোসযোগ্য মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। তাছাড়া, বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে একই ঘটনার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষ একাধিক পাল্টা-পাল্টি মামলা করে থাকেন। ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিকল্প বিরোধ এর বিধান থাকলে এ ধরনের মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে, যা মামলাজট হ্রাস করতেও সহায়ক হবে। পাশাপাশি তিনি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সাফল্যের জন্য বিচারপ্রার্থী জনগণের মানসিকতা পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। মামলা যে কেবল জয় কিংবা পরাজয়ের বিষয় নয়, বরং উভয় পক্ষই মামলার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে- এমন ধারণা বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সফল হবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

বেগম আয়েশা আক্তার সুমি, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ, তার বক্তব্যে দুইটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করেন।

প্রথমত, তিনি প্যানেল আইনজীবীগণের ফি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সরকারী আইনগত সহায়তা সংস্থার প্যানেল আইনজীবীগণের ফি স্বল্প হওয়ায় তারা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে উদ্যোগী হন না। তাদের সম্মানীর হার বৃদ্ধি করা হলে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের মামলাসমূহে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অধিকতর সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, যৌতুক নিরোধ আইনের অধীনে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলাসমূহের প্রকৃতি অপরাপর ফৌজদারি মামলা হতে পৃথক হওয়ায় এই মামলাসমূহে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সফল প্রয়োগের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই এই আইনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশিত হলে বিচারপ্রার্থী জনগণ উপকৃত হবে মর্মে তিনি মতামত প্রকাশ করেন।

জনাব মোঃ শওকত হোসাইন, যুগ্ম জেলা জজ, নোয়াখালী, তাঁর বক্তব্যে অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল নতুন করে তৈরী করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন,

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় যে উক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও কারিকুলাম বাংলাদেশের আদালতসমূহের মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং উক্ত মডিউলসমূহ Commercial Dispute সংক্রান্ত। তাই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সফল প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা ও মামলার ধরণকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে Special Training Module তৈরী করতে হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগের জন্য যতদূর সম্ভব অনাবশ্যক procedure বা legal formalities পরিহার করতে হবে। অন্যথায়, এ পদ্ধতি মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে না।

এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিলের পরই কেবল বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। এই বিধান পরিবর্তন করে মামলার যে কোন স্তরে (এমনকি জবাব দাখিলের পূর্বে) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি অনুমোদন করলে এই পদ্ধতি অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

জনাব বিশ্বনাথ মন্ডল, যুগ্ম-জেলা জজ, পাবনা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিচারকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সফল প্রয়োগে তিনি আইনজীবী সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব মাসরুর সালেকীন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর, উল্লেখ করেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৯এ ধারা অনুযায়ী বিচারক কর্তৃক মধ্যস্থতা কোনো কারণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মামলাটি জেলা জজের কাছে প্রেরণ করার বিধান রয়েছে। অথচ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর অধীনে এ ধরনের কোন মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সেই মামলাটি জেলা জজের কাছে প্রেরণ করতে হয় না, বরং উক্ত বিচারকই মামলাটির বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকেন। ফলে, একই বিচারক (সহকারী/সিনিয়র সহকারী জজ) দুইটি আলাদা আইনের অধীনে একই বিষয়ে দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

এছাড়া তিনি ফৌজদারি মামলাসমূহে Plea Bargain চালু করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন, যা বিকল্প উপায়ে ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন Negotiable Instrument Act এর অধীনে যে মামলাসমূহ দায়ের হয় অনেক সময়ই তা মামলা চলাকালীন অবস্থায় আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তাই এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহ আপোসযোগ্য করা হলে এবং এই আইনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা মামলা জট নিরসনে সহায়ক হবে।

জনাব আসিফ ইকবাল, যুগ্ম-মহানগর দায়রা জজ, খুলনা বলেন, Negotiable Instrument Act এর অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহকে যদি আপোসযোগ্য করা হয় সেক্ষেত্রে প্রায় ৭০% Negotiable Instrument Act এর মামলা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির মাধ্যমে সমাপ্ত করা সম্ভবপর হবে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিচারক তার আদালতের অন্যান্য দায়রা মামলা নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হতে পারবে যা মামলা জট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জনাব মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন কবির, যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ, কুমিল্লা, অন্যান্য বক্তাগণের অনুরূপ ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চালু করার পাশাপাশি সকল প্রকার ফৌজদারি মামলা আপোসযোগ্য করার সুপারিশ করেন।

বেগম সুমি আহমেদ, অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগের লক্ষ্যে বিচারকগণের অধিকতর সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তাছাড়া তিনি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সফল প্রয়োগ ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি জেলায় Mediation এ দক্ষ বিচারক বাছাইপূর্বক তাঁদের সমন্বয়ে একটি Mediation Group তৈরীর প্রস্তাবনা রাখেন।

জনাব মোঃ সিকান্দার জুলকার নাইন, সংযুক্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-জেলা জজ), আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন আবহমান বাংলায় গ্রাম পর্যায়ে যে সালিশ বা মধ্যস্থতা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে আমাদের আইনি ব্যবস্থার মূল পার্থক্য

হল, বিদ্যমান আইনে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির জন্য কোন প্রকট বা প্রচ্ছন্ন 'বল প্রয়োগের' বিধান নেই। তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, গ্রাম্য ব্যবস্থায় মধ্যস্থতার উদ্যোগে সাড়া না দেওয়া পক্ষকে সামাজিকভাবে বয়কট করার প্রথা এ ব্যবস্থায় এক ধরনের 'force' হিসেবে পরিগণিত হতো। একইভাবে তিনি, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য কমন ল রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে বলেন, সেসব দেশে 'মামলার খরচ প্রদান (cost implication)' সংক্রান্ত বিধান যে কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে নিস্পত্তির জন্য বড় ধরনের 'force' হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে, যে পক্ষ মধ্যস্থতায় সাড়া দিবে না, সে পরবর্তীতে মামলায় জয়লাভ করলেও তার মামলার খরচ পাওয়ার অধিকারী হবে না, এমনকি আদালত অনেক সময় অপরপক্ষের মামলার খরচও তাকে বহন করার আদেশ দিতে পারে। তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকে বিবেচনা করে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেশের আইনি কাঠামোতে 'মামলার খরচ প্রদান' সংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশ করা ও মধ্যস্থতার বিধানের সাথে এর কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন।

বেগম মাসুদা ইয়াসমিন, সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী জজ), জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকা, তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন-এ জেলা লিগাল এইড অফিসার-কে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি তাঁর বক্তব্যে এ সংক্রান্তে গৃহীত পাইলট প্রকল্পের সফলতা ব্যক্ত করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৪ সালের বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় এখন Pre-Case Mediation পরিচালনা সম্ভব এবং উক্ত প্রকারের মধ্যস্থতা দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয় মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে Pre-Case Mediation পরিচালনার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পাশাপাশি চলমান মামলাসমূহে লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে এডিআর করার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি বিশদ আলোকপাত করেন।

বেগম ইফাত মুবিনা ইউসুফ, উপ পরিচালক (যুগ্ম জেলা জজ), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি সম্পর্কে বিচারকগণকে উদ্বুদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব এস এম মাসুদ পারভেজ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে আদালতের কজলিস্টে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন, সিনিয়র সহকারী জজ, নেত্রকোনা, তার বক্তব্যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিতে পক্ষগণকে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উক্ত নিস্পত্তির ফলাফল কার্যকর করার জন্য বিচারকগণকে অধিক Discretionary Power প্রদান করার প্রস্তাব রাখেন।

জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ, সাতক্ষীরা, তাঁর বক্তব্যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী জজ, গাজীপুর, অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি এডিআর বাস্তবায়নের পথে ক্রিয়াশীল অন্যতম প্রধান একটি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাতেই Mediation Panel তৈরী হয়নি। যার ফলে কোন কোন আইনজীবী মধ্যস্থতা করতে পারবেন তা স্থির না থাকায় ঐসব জেলায় বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি কার্যকর হচ্ছে না। তিনি এ বিষয়ে জেলা জজগণের অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া তিনি প্রতি জেলায় যুগ্ম-জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারককে Mediation Officer হিসেবে নিয়োগ প্রদান করার প্রস্তাব রাখেন।

জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তাঁর বক্তব্যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে জেলা জজগণকে মূল ভূমিকা পালন করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি সকলকে জ্ঞাত করেন, দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৯এ ধারায় খুব শীঘ্রই লিগ্যাল এইড অফিসারকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান সম্বলিত সংশোধন আনীত হচ্ছে। এর পাশাপাশি তিনি এডিআর-কে আরো

কার্যকর করার লক্ষ্যে মধ্যস্থতায় লিগ্যাল এইড অফিসারের ভূমিকা সংক্রান্ত সকল সার্কুলারসমূহ একত্রিত করে সারা দেশের বিচারকগণের নিকট প্রেরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ।

জনাব গোলাম সরওয়ার, যুগ্ম-সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিচারকগণকে এডিআর বাস্তবায়নে ও তার সফল প্রয়োগে Facilitator এর ভূমিকা পালন করার আহবান জানান তিনি তাঁর বক্তব্যে আইনজীবীগণের মাঝে এডিআর বিষয়ক সচেতনতা তৈরীর উপরও গুরুত্বারোপ করেন ।

কর্ম অধিবেশনের এ পর্যায়ে অধিবেশনে উপস্থিত মাননীয় বিচারপতিগণ তাদের মতামত প্রদান করেন ।

মাননীয় বিচারপতি জনাব কাজী রেজাউল হক মহোদয় অভিমত পোষণ করেন, দেশের বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে এডিআর এর বিকল্প নেই । তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা যাতে মামলার যে কোন স্তরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যায় এ সংক্রান্ত আইনী সংস্কার আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন । তিনি আরও উল্লেখ করেন, উন্নত রাষ্ট্রসমূহের আদালতসমূহে পৃথক এডিআর অফিস ও কর্মকর্তা রয়েছে যা বাংলাদেশেও চালু করা প্রয়োজন ।

মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে জ্ঞাত করেন, সিংগাপুরে এডিআর পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শতকরা ষাট ভাগ মামলাজট হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে । তাই বাংলাদেশেও এডিআর পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মামলা জট নিরসন সম্ভব । তিনি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আপোসযোগ্য মামলার সংখ্যা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । পাশাপাশি তিনি বিচারকদের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেন । এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সুপ্রীম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অধস্তন আদালতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সফল এডিআর সম্পন্ন করতে হবে এমন শর্ত আরোপ করা যেতে পারে, যা এডিআর-কে আরও ফলপ্রসূ করবে ।

সবশেষে কর্ম অধিবেশনের সভাপতি **মাননীয় বিচারপতি জনাব সৌমেন্দ্র সরকার** সকলের মতামত মূল্যায়ন করে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকার অন্তরায় দূর করার আশাবাদ ব্যক্ত করে কর্ম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

উক্ত কর্ম-অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের আলোচনায় বিকল্প বিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা হতে উত্তরণে নিম্নরূপ সুপারিশ উঠে আসেঃ

সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম

১। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রয়োজন;

২। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক গণসচেতনতা সৃষ্টি;

৩। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে মধ্যস্থতাকারী আইনজীবীগণের ফি বৃদ্ধি;

৪। আইনজীবীদের মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৫। বর্তমানে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউলে বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতা ও আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা;

৬। বিচারকের নির্ভরযোগ্যতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে কিভাবে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা;

৭। বর্তমানে কর্মরত বিচারকদের মধ্যে থেকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের নিয়ে Mediation Group তৈরী;

৮। দৈনিক কার্যসময়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পৃথক সময় বরাদ্দ;

৯। প্রতি জেলায় Panel of Mediator যথা নিয়মে প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ;

১০। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সকল বিধিমালার সংকলন প্রস্তুতক্রমে সারাদেশের বিচারকগণের মধ্যে বিতরণ;

প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার

১। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধিমালা অদ্যাবধি প্রণীত হয়নি। এটি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২। দেওয়ানী কার্যবিধির অনুরূপ ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩। ফৌজদারি কার্যবিধি ও দন্ডবিধির সংশোধনপূর্বক আপোসের বিধান আরো বিস্তৃত ও সহজতর করা।

৪। ফৌজদারি মামলার যে কোনো স্তরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করা।

৫। দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধনপূর্বক বিবাদির জবাব দাখিলের পূর্বে কিংবা মামলার যে কোন পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন।

৬। ২০০৭ সালে আইন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত Plea Bargain চালু করা সংক্রান্ত সুপারিশের বাস্তবায়ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭। Negotiable Instrument Act এর আওতাধীন অপরাধকে আপোসযোগ্য করে দায়রা আদালতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা জট হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে, দেওয়ানী মামলায় Cost Implication এর বিধান রাখা।

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অধিবেশন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা** এর সভাপতিত্বে ২য় দিনের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের কর্ম-অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সকল অতিথি এবং বিচারকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিচারকগণ সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তাই বিচারকদের যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশেও ন্যায় বিচারের মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

মাননীয় সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বিচারকদের প্রতি নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেনঃ

১. আদালতের সময়ের সঠিক ব্যবহারের নিমিত্ত কোর্ট ডায়েরীতে পর্যাপ্ত মামলা রাখতে হবে এবং আইনজীবীদের সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

২. জেলা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে বিচারকদের বিচারিক কাজে কখনো হস্তক্ষেপ করবেন না।

৩. মামলাজট কমানোর জন্য বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আইনজীবীদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪. বিচারকদের নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। আইন অনুযায়ী এবং উচ্চ আদালতের নজির মেনে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হবে।

৫. মিথ্যা মামলা কমাতে দেওয়ানী মামলার আরজি গ্রহণ এবং ফৌজদারি মামলা আমলে গ্রহণের সময় বিচারকদের আরও সতর্ক হতে হবে।

পরিশেষে **মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা** জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন-২০১৬ এর দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনা ও দিক নির্দেশনা অধস্তন আদালতের প্রশাসন ও বিচার কাজ পরিচালনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আর এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয় দুই দিনব্যাপী জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন-২০১৬।

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ এর ২য় দিনের উদ্বোধনী অধিবেশন

সম্মেলনের ২য় দিনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ভাষণ দিচ্ছেন

"নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক কর্ম অধিবেশন

"ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের সমস্যা ও করণীয়" শীর্ষক কর্ম অধিবেশন

“আদালত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়” শীর্ষক কর্ম অধিবেশন

“বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে বাধা ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক কর্ম অধিবেশন

একটি কর্ম অধিবেশনে কার্যরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের একাংশ

একটি কর্ম অধিবেশনে কার্যরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের একাংশ

আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা ২য় দিনের সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য প্রদান করছেন

সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের একাংশ

বেগম ফাতেমা রশীদ হাসান, ডেপুটি টিম লিডার, সিএলএস, সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আইনগত সহায়তা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করছেন

সম্মেলনে উপস্থিত সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রিতে কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ। (বাম থেকে ডানে) জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, জনাব সৈয়দ মোস্তফা রেজা নূর, জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, জনাব মোঃ আজিজুল হক, জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার, জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, জনাব মোঃ আতিকুস সামাদ, বেগম হোসনে আরা আকতার, জনাব মো'তাছিম বিল্যাহ, জনাব মোঃ জাকির হোসেন, জনাব শরীফুল আলম ভূঞা, জনাব মোঃ সাব্বির ফয়েজ, জনাব অরুনাভ চক্রবর্তী, জনাব এস, এম, এরশাদুল আলম, জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন চৌধুরী, বেগম ফারজানা ইয়াসমিন, জনাব মোঃ শামীম সুফী, জনাব মোঃ যাবিদ হোসেন এবং জনাব মোসাদ্দেক মিনহাজ্